দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

রাহুলের জাতপাতের রাজনীতি : দেশকে এক সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে
— পৃঃ ১২

দাদু পার্সি, ঠাকুমা মুসলমান, মা খ্রিস্টান, রাহুল কিন্তু 'উপবীতধারী ব্রাহ্মণ'
— পৃঃ ১৭

৭০ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।। ১ জানুয়ারি ২০১৮।। ১৬ পৌষ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ১৬ পৌষ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১ জানুয়ারি - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

খোলা চিঠি : আঠারোর আশঙ্কা নিয়েই সতেরোর ষোলোআনা শেষ দিদির □ সুন্দর মৌলিক □ ১০

গুজরাটে বিজেপির নৈতিক পরাজয়ের তত্ত্বটি বোঝা গেল না □ গূঢ়পুরুষ □ ১১

রাহুলের জাতপাতের রাজনীতি দেশকে এক সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২

গুজরাট কঠিন জায়গা, ছদ্মবেশী 'শিবভক্ত'রা বুঝেছেন □ তরুণ বিজয় □ ১৪

ভারতীয়ত্বে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতৃত্বের আরও সচেতনতা চাই □ দেবীপ্রসাদ রায় □ ১৫

দাদু পার্সি, ঠাকুমা মুসলমান, মা খ্রিস্টান, রাহুল কিন্তু 'উপবীতধারী ব্রাহ্মণ' □ রঞ্জন কুমার দে □ ১৭

ভিলেনরা একজোট হলে নায়ককে লড়েই জিততে হয় □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ১৯

নির্বাচনে হারের পর হার : মিডিয়ায় রাহুল এখনও নেতা □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ২০

গুজরাট জয় : দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড়ো সাফল্য □ অভিমন্যু গুহ □ ২২

ষষ্ঠবার নির্বাচনে জিতে দক্ষতার পর্যাপ্ত প্রমাণ রেখেছে বিজেপি □ জয় পণ্ডা □ ২৭

ভারতে বর্ণাশ্রম তত্ত্ব ও প্রয়োগ □ ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস □ ৩১

ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন দশাবতার তাস □ চূড়ামণি হাটি □ ৩৩

দ্রিঘাংচুর ভুয়োদর্শন : রাহুলবাবা পার করেগা □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ □ অঙ্গনা : ৩৪ □ সুস্বাস্থ্য: ৩৭ □ অন্যরকম : ৩৮ □ স্বজনবিয়োগ : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ চিত্রকথা : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা

জি জি বিড়লা স্কুলে পাঠরতা সেই বাচ্চা মেয়েটির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। মেয়েটি তার শৈশবেই এক নারকীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। রক্ষককে সে দেখেছে ভক্ষকের ভূমিকায়। এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। এরপর যদি স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তাটুকুও না থাকে তাহলে তা এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় সেই ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরবেন এ সময়ের দুই বিশিষ্ট লেখক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস এবং ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সবং : উৎসাহিত বিজেপি

উপনির্বাচনে সাধারণত শাসক দলই জয়লাভ করে। এই ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই রাজ্যের সবং বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রত্যাশামতো শাসক দলই জয়লাভ করিয়াছে। এই উপনির্বাচনে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এতদিন এই আসন ছিল কংগ্রেসর, এখন তাহা তৃণমূলের দখলে। শুধু তাহাই নহে, কংগ্রেস এক নম্বর হইতে চতুর্থস্থানে নামিয়া আসিয়াছে। অন্যদিকে বামপন্থীদের ভোট কমিলেও তাহারা দ্বিতীয় স্থানে উঠিয়া আসিয়াছে। আবার ভোটে না জিতিলেও বিজেপির ফল সকলের নজর কাড়িয়াছে। ২০১৬ সালে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ছিল ৫৬১০। এই উপনির্বাচনে তাহা বাড়িয়া হইয়াছে ৩৭,৫৭৬। শতাংশের হিসাবে আড়াই শতাংশ হইতে বৃদ্ধি হইয়া ১৮ শতাংশ হইয়াছে।

এই ফলাফল আগামী নির্বাচনে বিজেপি-কে যে আরও ভাল ফল করিতে উৎসাহিত করিবে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সবং উপনির্বাচনে বিজেপি তৃতীয় স্থানে থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রাপ্ত ভোট বৃদ্ধির জন্য নিজের খুশি জানাইয়াছেন এবং এই রাজ্যে দলীয় কর্মীদের উৎসাহ দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের দিকেও যে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দৃষ্টি রাখিয়াছেন ইহা তাহার নিদর্শন। প্রধানমন্ত্রী নিজের ট্যুইট বার্তায় যেভাবে রাজ্যের জনগণকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন তাহাতে রাজ্য-রাজনীতিতে গতি সঞ্চার হইবে। রাজ্যের এক উপনির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর ট্যুইট বার্তা এই কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ।

আজ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর শাসনাধীন থাকিলেও বামপন্থীদের প্রভাব হইতে এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। বামপন্থীরা এই রাজ্য একটানা চৌত্রিশ বৎসর শাসন করিয়াছে—বিষয়টি এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে। বামপন্থীরা নিজেদের মতাদর্শের কারণেই স্বাভাবিকভাবে বিজেপি বিরোধী। তাই বিজেপির তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান দখল লইয়া তাহাদের মাথাব্যথা নাই। প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা যে বাড়িতেছে—ইহাই তাহাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে ১৮ শতাংশ ভোট প্রাপ্তি ও সেই কারণে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন সূচক বার্তা তাই বিস্ময়ের বিষয় নয়। দলীয় কার্যকর্তাদের উৎসাহদানই মুখ্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার বার্তায় আরও জানাইয়াছেন— পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোনও সুযোগই ছাড়া হইবে না। এই বার্তায় তাই স্পষ্ট—পশ্চিমবঙ্গও বিজেপির কাছে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সহিত দেশের অন্য দুইটি রাজ্য কেরল ও ত্রিপুরাও বিজেপির নজরে রহিয়াছে। পশ্চিম হইতে পূর্ব এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত নিজেদের দখলে আনিতে বিজেপি এখন তৎপর। তাই প্রধানমন্ত্রীর এই ট্যুইট বার্তা শুধু বিজেপির জন্য নয়, কংগ্রেসের প্রতিও চ্যালেঞ্জ। সবং কংগ্রেসের গড় হওয়া সত্ত্বেও এই উপনির্বাচনে তাহাদের জামানত জব্দ হইয়া গিয়াছে। তাই সবং উপনির্বাচনের ফলাফল বিজেপির পক্ষে ইঙ্গিতবাহী।

সুভাষিতম্

জলমভ্যাসযোগেন শৈলানাং কুরুতে ক্ষয়ম্।

কর্কশানাং মৃদুস্পর্শঃ কিমভ্যাসান্ন সাধ্যতে।।

অভ্যাসের কারণে কোমল জলও কঠোর পর্বতকে ক্ষয় করে ফেলে। তাই অভ্যাসের দ্বারা কোন বস্তু লাভ হবে না?

হিন্দুরা যেখানে দুর্বল হয়েছে, সেখানেই বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে : মোহনরাও ভাগবত

আগরতলা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ গত ১৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত পাঁচদিনের সফরে আগরতলায় আসেন। ১৫ ডিসেম্বর রাজধানী আগরতলা থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার দূরে শহরের পূর্বপ্রান্তে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় চাম্পামুড়াস্থিত সেবাধাম পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বিবিধ ক্ষেত্রের কার্যকর্তাদের সঙ্গে পরিচয়াত্মক বৈঠকে বসেন।

১৭ ডিসেম্বর আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে স্বামী বিবেকানন্দ মাঠে এক অভূতপূর্ব জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখেন। হিন্দু মালয়ামা সমিতি এই সমাবেশের আয়োজন করে। সেদিন তাঁর বক্তৃতায় স্বদেশভক্তি, রাষ্ট্রচিন্তা, হিন্দুত্ব, সমরসতা, ভারতীয় সংস্কৃতির মাহাত্ম্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পায়। মোহনজী সেদিন তাঁর ভাষণে বলেন, হিন্দুত্ব কোনও সম্প্রদায় নয়, এটি জীবনধারা, সনাতন, স্বয়ম্ভু বা মহেশ্বর। সনাতন ধর্ম হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ধর্ম। হিন্দুরা চিরকাল সত্যকে পাথেয় মনে করে, কিন্তু বাদবাকি দুনিয়া কেবল শক্তিকে ভিত্তি করে চলতে চায়। তাদের কাছে শক্তি সবচেয়ে বড় বিষয়। হিন্দু সমাজে দুর্বলতার কারণে এই শক্তি বিনষ্ট হচ্ছে।

তিনি বলেন, হিন্দুরা যেখানে দুর্বল হয়েছে, সেখানেই বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে। কেবলমাত্র হিন্দু সমাজ নয়, এই দেশেরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। অন্যথায় দেশভাগ হতো না। এ প্রসঙ্গে তিনি পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, হিন্দু সমাজের দুর্বলতার ফলে পাকিস্তান এই দেশে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যদিও বর্তমান পাকিস্তান, কাবুলে হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন এখনও বিদ্যমান।

মোহনজীর ভাষায়, হিন্দুরা সত্যকে মানে বাকিরা শক্তিকে। তাই তিনি শক্তি ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন, শক্তির জন্য সংগঠন এবং সংগঠিত হওয়া দরকার। শক্তিসম্পন্ন হওয়া মানেই সংগঠিত থাকা। শক্তিযুক্ত হতে গেলে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের প্রয়োজন। শক্তিশালী হলে সুরক্ষার নিশ্চয়তা মিলবে। তাই শক্তি অর্জনের জন্য তিনি হিন্দু সমাজের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

বক্তৃতাদানকালে তিনি সমাজ পরিবর্তনের জন্য চেতনা বিকাশের উপর জোর দেন। বেশি জোর দিয়েছেন মানবচেতনা বিকাশের উপর। এটা তিনি দেখে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই পরিবর্তন এখনো আসেনি। তিনি শ্রীঅরবিন্দের কথা স্মরণ করে বলেন, চেতনা বিকশিত হলে মানব বিকশিত হবে, মানব বিকশিত হলে সমাজ বিকশিত হবে। তিনি বলেন ঋষি অরিবিন্দের ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হতে চলেছে। এদেশের অধর্মের নাশ ও ধর্মের সংস্থাপন হতে চলেছে।

মোহন ভাগবত সেদিন তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করেন ত্রিপুরায় উগ্রবাদী কর্তৃক অপহৃত ও পরে নিহত চার স্বয়ংসেবকের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে ৬ আগস্ট ত্রিপুরার উত্তর অঞ্চলের কাঞ্চনছড়ার পার্বত্য পল্লী থেকে উগ্রবাদী কর্তৃক অপহৃত হন চারজন স্বয়ংসেবক এবং পরে তাদেরকে হত্যা করা হয়। তাঁরা হলেন— শ্যামল সেনগুপ্ত, সুধাময় দত্ত, দীনেন্দ্রনাথ দে এবং শুভঙ্কর চক্রবর্তী। এই চার কার্যকর্তা ও প্রচারকের বলিদানের ইতিহাস তিনি জনসমাবেশে আগত উপস্থিত জনতার সামনে তুলে ধরেন। বলেন, রাজ্যে সঙ্ঘ কার্যকর্তারা সংগঠিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তাঁদের রক্ত দিয়েছেন।

এই হিন্দু মিলন মেলায় সমাজের বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, রাজপরিবারের সদস্য, মঠ-মন্দিরের সাধু-মহারাজ, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিক, লেখক ও গবেষক, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। উপজাতি সমাজের নারী- পুরুষের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের ছাত্র-যুবকদের যোগদান ছিল লক্ষণীয়। সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া দলের এমন কয়েকজন বিধায়ক ও নেতাকে সেদিনের সমাবেশে হাজির থাকতে দেখা গিয়েছে।

মোদীর কূটনৈতিক সাফল্যের কথা ট্রাম্প প্রশাসনের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৭ সালকে মোদীর বিদেশনীতির বছর হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইছেন কূটনীতিকরা। প্রথম কারণ চীনের চোখে চোখ রেখে কথা বলা। যে কারণে ডোকলাম থেকে চীনা সেনার পশ্চাদপসরণ। ১৯৬২-র পর থেকে যে দৃশ্য গোটা পৃথিবীর সামনেই অকল্পনীয় ছিল। সম্প্রতি পিটি আই-কে আমেরিকান ব্যুরো অব্ সাউথ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়ার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি সহ-সচিব টম ভাজডা বলেছেন ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ২০১৭ সালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেছেন হায়দরাবাদে আন্তর্জাতিক উদ্যোগপতি শিখর-সম্মেলন ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজন করতে পেরে তাঁরা বাধিত। তিনি এও বলেছেন যে আগামী বছরও ভারতের সঙ্গে একই রকমের সুসম্পর্ক, একই ধরনের যৌথ উদ্যোগ তাঁরা বজায় রাখতে আগ্রহী।

কূটনীতিকরা মনে করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচারে ভারতকে তাঁদের 'সেরা বন্ধু' বলে যে অভিহিত করেছিলেন, তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। আর এসবেরেই জন্য মোদীর বিদেশনীতির সাফল্য প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ বিশ্বের সামনে চীন ও পাকিস্তানের বিপদ এতটা স্পষ্ট করে আর কেউ তুলে ধরতে পারেনি, যতটা ভারত পেরেছে মোদীর আমলে। মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই দুই দেশের ভারত বিরোধী সন্ত্রাসে মদতের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাবও নিয়েছিলেন। ফলে পাক চীনের অসদুদ্দেশ্য বিশ্বের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কূটনীতিকরা এও মনে করেন যে অতি সম্প্রতি ট্রাম্প যে তাঁর প্রথম ভারতীয় নিরাপত্তা কৌশল প্রকাশ করেছেন তাতে ভারতকে নেতৃত্বদানকারী বিশ্ব শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করার কারণ হচ্ছে ডোকলামে ভারতের সাফল্য। চীনও তাদের এই নৈতিক পরাজয়ের পর ডোকলাম রণনীতি পুনর্বিবেচনার কথা বলেছে। ভারতের আরও বড়ো কূটনৈতিক সাফল্য হলো আফগানিস্তানে তাদের কাজের সাফল্যের স্বীকৃতি প্রথমবারের জন্য কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া। ট্রাম্প স্বীকার করেছেন আফগানিস্তানের গঠনে ভারত মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই সূত্রেই পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিচ্ছে একথাও প্রথমবারের জন্য সরকারিভাবে স্বীকার করেছে আমেরিকা। কূটনীতিকদের মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতই যে প্রধান ভরসা সেকথা নরেন্দ্র মোদীর কূটনৈতিক পরিকল্পনার জন্যই বিশ্ব বুঝতে সক্ষম হয়েছে। আমেরিকাও মোদীর কূটনৈতিক সাফল্যের গুণগান করতে বাধ্য হচ্ছে এখন। যে কারণে কেনিথ জুমটারের মতো একজন ভারত বন্ধুকে এদেশের আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

নরেন্দ্র মোদী কূটনৈতিকভাবে এতটাই সফল যে পাক দখলীকৃত কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের পরিকল্পনা করে ভারতের সার্বভৌমত্বে আঘাতের চেষ্টা করছে চীন- পাকিস্তান, এমনটাই মনে করেছে আমেরিকা। চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড-এর বিষয়ে ভারতের অবস্থানকেও সমর্থন করেছে আমেরিকা। আমেরিকা তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গেও যা করেনি তাই করেছে ভারতের সঙ্গে-'একশ বছরের পরিকল্পনা', একমাত্র ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশ আমেরিকার এই সম্মানের ভাগীদার হয়নি। মোদী প্রসাসন বিদেশ সচিব এস জয়শঙ্কর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে প্রতি ছ' মাস অন্তর হোয়াইট হাউসের সঙ্গে বসার জন্য দায়িত্ব দেওয়ায় এই কূটনৈতিক সাফল্যের মুখ দেখা গিয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাকিস্তানকে ভারতের জবাব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কিছুদিন আগেই পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছিল, তার জবাব দেবার জন্যই ভারত নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে বুঝিয়ে দিয়েছে এবার থেকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভাঙলে তার ফল ভাল হবে না। সেনা গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে গত ২৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনা নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে পড়ে। মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন পাক সেনা নিহত হয়। আহত হয় একজন। উল্লেখ্য, এই ঘটনার কিছুদিন আগে কোনওরকম প্ররোচনা ছাড়াই পাক সেনা জম্মু-কাশ্মীরের কেরি সেক্টরে ঢুকে হামলা চালায়। ভারতীয় সেনা তার যথাযোগ্য প্রতিরোধ করলেও একজন মেজর ও তিন জওয়ানের মৃত্যু হয়। ২৬ ডিসেম্বরের জবাব এই ঘটনারই প্রতিক্রিয়া। এর আগে উরি সেনাছাউনিতে পাকিস্তানের কাপুরুষোচিত হামলার পর ভারত পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল। সেবার নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাক-মদতে পুষ্ট জঙ্গিদের লঞ্চপ্যাড গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ২৬ ডিসেম্বরের জবাব অনেকটা সেই ছাঁদেরই। শুধু সেবার প্রতিপক্ষ ছিল জঙ্গিরা, এবার পাক সেনাবাহিনী।

২-জি স্পেকট্রাম : অভিযুক্তরা মুক্ত, গান্ধী পরিবারের যোগ নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কংগ্রেস এবং ডিএমকে নেতারা আপাতত ১ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকার ২-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি থেকে অব্যাহতি পেয়ে উল্লসিত। কিন্তু তাদের এই আনন্দ কতদিন স্থায়ী হয় সেটাই এখন দেখার। বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক ওপি সাইনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের অফিসের ভূমিকা নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাতে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। বিচারপতি সাইনি তার রায়ে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর অফিসের আমলা পুলক চ্যাটার্জি অভিযুক্ত এ. রাজার লেখা চিঠির গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুছে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ মনমোহন সিংহকে দেন। মুছে দেওয়া অংশে যেসব তথ্য ছিল তা পুলক চ্যাটার্জি আগেই (৬ জানুয়ারি, ২০০৮) জানতে পেরেছিলেন। এ. রাজার দেওয়া তথ্যের অংশবিশেষ মুছে দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেন।' তিনি আরও বলেন, 'লেটার অব ইনটেন্ট দাখিল এবং ইউএএস লাইসেন্স প্রদান— এই দুই ঘটনায় সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। যে কারণে এই মামলা চলছে। এ. রাজা পরিবর্তিত নিয়মকানুন মেনে নেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের কথা মনমোহন সিংহকে সময়মতো জানানো হয়নি। তিনি জানতে পারেন লেটার অব ইনটেন্ট দাখিল হবার পর।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় এক দশক আগে সাংবাদিক শালিনী সিংহ এবং জে. গোপালকৃষ্ণন প্রথম ইঙ্গিত দেন, প্রধানমন্ত্রীর অফিসে এমন কেউ আছেন যিনি টুজি টেলিকম লাইসেন্সের ফার্স্ট-কাম ফার্স্ট-সার্ভ নীতি বদলে ফার্স্ট-পে ফার্স্ট-সার্ভ করে দেন। তাঁরা কংগ্রেস এবং ডিএমকে হাইকম্যান্ডের এ ব্যাপারে জড়িত থাকার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন।

বস্তুত, এ. রাজা নেহাতই কংগ্রেস

সুব্রহ্মণ্যম স্বামী

হাইকম্যান্ডের 'তল্পিবাহক' ধরনের নেতা। তাঁকে লাইসেন্সের ফার্স্ট-কাম ফার্স্ট-সার্ভ নীতি পরিবর্তনের 'নির্দেশ' দেওয়া হয়েছিল। এবং তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেন। ২০০৭-২০০৮ সালে তিনি পরিবর্তনের কথা জানিয়ে মনমোহন সিংহকে ৩টি চিঠি লিখেছিলেন। এরপরেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন পুলক চ্যাটার্জিরা। এখন প্রশ্ন, কে এই পুলক চ্যাটার্জি? তাঁর পেশাগত পরিচয় তিনি একজন উচ্চপদস্থ আমলা। এছাড়াও তাঁর অন্য পরিচয় আছে। তিনি গান্ধী পরিবারের ঘনিষ্ঠ। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তার অফিসে যুগ্ম-সচিব ছিলেন। পরে সোনিয়া গান্ধীর অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হন। মাঝখানে কিছুদিন রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনের বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন। বিচারক ও.পি. সাইনির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ২০০৭-০৮ সালে যখন ২-জি টেলিকম লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছিল তখন এই পুলক চ্যাটার্জিই মনমোহন সিংহকে লেখা এ. রাজার চিঠির গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুছে দেন।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, ফার্স্ট-কাম ফার্স্ট-সার্ভ নীতি বদলিয়ে ফার্স্ট-পে ফার্স্ট-সার্ভ করার ফলে ঘুষ নিয়ে লাইসেন্স দেবার বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। ঘুষ দেওয়া-নেওয়া কি সত্যিই হয়েছিল? উত্তর, হ্যাঁ। অন্তত সারকামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। ইউপিএ সরকারই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল এবং সিবিআই প্রথম থেকেই সার্চলাইটের নীচে রেখেছিল শুধু এ. রাজাকে। সুন্দর করে সরিয়ে রাখা হয়েছিল টেলিকমিউনিকেশন মন্ত্রকের পদস্থ আমলাদের। বিচারপতি সাইনির রায় স্পষ্টতই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অফিসের দুই আমলা পুলক চ্যাটার্জি এবং টি.কে.এ নায়ারের দিকে আঙুল তুলেছে।

ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, কার নির্দেশে এইসব আমলা কাজ করতেন? কেই বা তাদের নির্দেশ দিয়েছিল এ. রাজার চিঠি কাটছাঁট করে মনমোহন সিংহকে দেওয়ার জন্য? সন্দেহ নেই যিনিই নির্দেশ দিয়ে থাকুন তিনি মনমোহন সিংহের থেকেও প্রভাবশালী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কংগ্রেস এবং ডিএমকে-র শীর্ষনেতৃত্বের অঙ্গুলিহেলনেই প্রধানমন্ত্রীর অফিসের কাজকর্ম চলত। তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন পদস্থ আমলাদের। সুতরাং এই ব্যাপারে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড, বিশেষ করে প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। সকলেই ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন হিসেবে তিনি যে নকশা তৈরি করে দিতেন, সরকার তা-ই অনুসরণ করত। অথচ বলির পাঁঠা বানানো হয়েছিল শুধু এ. রাজাকে। এদিকে এ. রাজা এবং কানিমোঝি আদালতের নির্দেশে মুক্তি পাওয়ায় বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, সিবিআই-এর অপদার্থতার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। তদন্তকারী অফিসাররা যথেষ্ট সিরিয়াস ছিলেন না। কথাটা সর্বাংশে মিথ্যে নয়। আদালতের এই রায় নরেন্দ্র মোদীর দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়ার সংকল্পে একটা জোর ধাক্কা। সুব্রহ্মণ্যম স্বামী দাবি করেছেন সরকার অবিলম্বে রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করুক। দেশও তাই চায়। যত শীঘ্র এই চাহিদা পূরণ হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

বিমুদ্রীকরণ পরবর্তীকালে করদাতাদের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০১৬-র নভেম্বর থেকে ২০১৭-র মার্চ পর্যন্ত প্রায় ৯০০টি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৭ হাজার ৯০০ কোটি টাকারও বেশি অঘোষিত আয়ের সন্ধান পেয়েছে আয়কর দপ্তর। ওই সময়কালে ৮ হাজার ২০০টি সমীক্ষার ফলে অঘোষিত আয়ের হদিশ পাওয়া গেছে ৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকারও বেশি। অন্যদিকে, এপ্রিল ২০১৭ থেকে অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত ২৭৫টি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আয়কর দপ্তরের অভিযানের ফলে খোঁজ পাওয়া গেছে ৭ হাজার ৮০০ কোটি টাকারও বেশি অঘোষিত আয় ও উপার্জনের। ওই একই সময়কালে দপ্তরের পক্ষ থেকে সমীক্ষার কাজ চালানো হয় ৩ হাজার ৬১টি যা থেকে অঘোষিত আয়ের সন্ধান মিলেছে ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকারও বেশি। এসবই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে।আয়কর দপ্তরের উদ্যোগ ও তৎপরতায় বিমুদ্রীকরণ পরবর্তীকালে দেশে করদাতার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরের ৭ নভেম্বর পর্যন্ত ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ আয়কর রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে। তুলনায় বিগত আর্থিক বছরে এই সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ২৫ লক্ষ। অর্থাৎ বিগত এক বছরের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯.৫ শতাংশ। গত নভেম্বর মাস পর্যন্ত ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.৮ লক্ষ কোটি টাকা। তুলনায় বিগত আর্থিক বছরে মাত্রা ছিল ৪.২০ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে ১৪.৩ শতাংশ।

উবাচ

"বিরোধী আসনে বসে আধার ইস্যুতে কংগ্রেস ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে।"

অরুণ জেটলি
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

আধার সংক্রান্ত বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের ভূমিকা প্রসঙ্গে

"তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার উদার মনোভাব দেশকে বিশ্বমঞ্চে এক উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনের শুভেচ্ছা উপলক্ষে ট্যুইট বার্তায়

"যখন কেউ বলেন আমি মুসলমান, কিংবা আমি খ্রিস্টান অথবা আমি হিন্দু তখন বোঝা যায় তাঁর একটা শেকড় আছে। কিন্তু যখন কেউ বলেন তিনি ধর্মনিরপেক্ষ তখন তার শেকড় আছে কি নেই বোঝা যায় না।"

অনন্ত কুমার হেগড়ে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

ধর্ম সম্বন্ধে ভারতীয়দের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে

"সব খেয়াল রাখছে কেন্দ্র। তদারকি কমিটিতে যোগ্য বিজেপি কর্মীদেরও রাখতে হবে।"

অর্জুনরাম মেঘওয়াল
কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের তদারকি কমিটিতে তৃণমূল কর্মীদের একচেটিয়া নিয়োগ প্রসঙ্গে

"বিজেপির বাড়বাড়ন্ত রুখতে সবং উপনির্বাচনে সিপিএমকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছে তৃণমূল।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য সভাপতি

সবং উপনির্বাচনে সিপিএমের দ্বিতীয় হওয়া প্রসঙ্গে

আঠারোর আশঙ্কা নিয়েই সতেরোর ষোলো আনা শেষ দিদির

মাননীয় দিদি,

বর্ষ শুরুর চিঠিতে দিদিই ডাকলাম। আর নেত্রী বলতে ভালো লাগছে না।

আলোর বৃত্তে, প্রচারের আলোয় সবাই থাকতে ভালবাসে। রাজনীতিকরা তো বটেই। আর আপনি তো আরও বেশি করে। দীর্ঘ দু'দশক বঙ্গ রাজনীতির আকাশে আপনিই একমাত্র সূর্য হয়ে থেকেছেন। বিরোধী নেত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া এবং তারপরে আপনার ধারে কাছে কেউ ছিল না। গ্রহ, উপগ্রহরা যেটুকু আলো পেয়েছে তা সূর্যের আভা থেকেই।

কিন্তু ২০১৭ সালে আলো ছিনতাইয়ে নিজের 'মনোপলি' ধরে রাখতে পারলেন না দিদি। ধর্মযুদ্ধে বারবার কাহিল হতে হয়েছে আপনাকে। একদিকে নরেন্দ্র মোদীর দাপট, অমিত শাহর হুঙ্কার। অন্যদিকে, বাংলাতেও সারাটা বছর রাম-বাহিনীর উত্থান।

বছরের শুরুতে নোটবাতিলের রেশ ছিল রাজনীতিতেও। কিন্তু তখন আমজনতার সহানুভূতি ছিল মোদীর দিকে। ধীরে ধীরে নোটবাতিল মানুষের গা-সওয়া হয়ে যাওয়ায় আপনার বিরোধী স্বর আর আলো পায়নি। এর পরে জিএসটি নিয়েও একই পরিণতি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর 'এক দেশ, এক কর' প্রচার ছিল অনেক জোরালো।

২০১৭ সালে রাজ্যজুড়ে রামনবমীর শোভাযাত্রা নিয়ে যে পরিমাণ নিউজপ্রিন্ট, এয়ারটাইম, ওয়েবস্পেস খরচ হয়েছে তার কাছাকাছি আসতে পারেনি রাজ্যে শাসক দলের কোনও কর্মসূচি। ধর্মযুদ্ধ একটাই ছিল না। এর পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তিন তালাক 'না' হয়ে যাওয়াতেও নড়বড় করেছে আপনার তৃণমূল কংগ্রেস। এখনও দলের কোনও স্পষ্ট নীতি জানাননি আপনি। স্পষ্ট হয়ে রয়েছে 'শ্যাম রাখি না কূল রাখি' সঙ্কট। আবার দুর্গাপুজোর বিসর্জন আর মহরমের মিছিল নিয়েও আদালতে রীতিমতো নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে আদালতে। পাহাড়ের কথা তো না বলাই ভালো।

তারই মধ্যে পুজোর বাজারে প্রচারের সব আলো কেড়ে নেন মুকুল রায়। কার্যত মা-দুর্গাকেও ২০১৭ সালে হার মানতে হয়েছে মুকুল-জল্পনার কাছে। দুর্গা চতুর্থী থেকে শুরু করে একেবারে বছরের শেষ পর্যন্ত আলোচনায় মুকুল। 'বিশ্ববাংলা', 'জাগোবাংলা' বিতর্ক রাজনীতিতে প্রশ্নের ঢেউ তুলেছে।

সত্যি কথা বলতে গেলে বাংলার রাজনীতিতে এবার আপনার সবং টুকুই প্রাপ্তি। যা আদতে কোনও প্রাপ্তিই নয়। বিজেপি ছ-গুণ ভোট বাড়িয়ে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

সারাটা বছর একটিবারের জন্য কোনও আলোচনাতেই আসেনি কংগ্রেস নামক দলটা। সিপিএম তবু এসেছে। একবার নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমারের জন্য আর একবার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা 'কেচ্ছা' অভিযোগে।

সতেরো সালে রাজনৈতিক প্রাপ্তি যদি কারও হয়ে থাকে তবে তিনি মানস ভুঁইয়া। এতটা প্রাপ্তি আপনার প্রাণের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও হয়নি। যুব তৃণমূল থেকে এখনও মূল তৃণমূলে জায়গা পাননি ভাইপো। আর মানস নিজে রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন। স্ত্রী গীতারানিকে বিধায়ক করেছেন। ছেলে কৌশিকের জন্য রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পেরেছেন।

আর বিজেপি? বাড়ছে, শুধু বাড়ছে। দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে জনজাগরণ যাত্রা। চলবে ২০১৮-র জানুয়ারি পর্যন্ত। নতুন বছরটা আবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বছর। সুতরাং, রাজনীতির আঙিনায় অনেক আলো-আঁধারির খেলা দেখা যাবে সেটা নিশ্চিত। সেসব নিয়ে এখনই জল্পনা নিরর্থক। তবে এটা ঠিক যে, সতেরোর শেষে দিদির হাতে রইল পেনসিল।

—সুন্দর মৌলিক

গুজরাটে বিজেপির নৈতিক পরাজয়ের তত্ত্বটি বোঝা গেল না

গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত পূর্ব মেদিনীপুরের সবং বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ব্যাপক অশান্তি হয়েছে। অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রে বিজেপি-সহ বিরোধী দলের এজেন্টদের মারধর করে তাড়িয়ে দেয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। অথচ এতটা অশান্তির কারণ ছিল না। সবং কেন্দ্র থেকে পাঁচবার কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়িয়ে মানস ভুঁইঞা বিধায়ক হয়েছেন। এবার এই আসনে প্রার্থী তাঁর স্ত্রী গীতা ভুঁইঞা। মানসবাবু কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া এবং সাংসদ হওয়ার জন্য আসনটি শূন্য হয়। সবং কেন্দ্রটি ভুঁইঞা পরিবারের খাসতালুক। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল কাঁথির তৃণমূল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর দলবলের পেশি শক্তি। শুভেন্দুবাবু ভোটের আগেই ঘোষণা করেছেন যে কমপক্ষে ৮০ হাজার ভোটের ব্যবধানে তিনি গীতা ভুঁইঞাকে জিতিয়ে আনবেন। পরিস্থিতি যদি এতটাই সহজ সরল হয় তবে অশান্তির আবহে সবং কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে কেন? মানসবাবু নিজে সেখানে উপস্থিত থেকে ভোট পরিচালনা করেছেন। তারপরেও মাঠে নামাতে হয়েছে গুণ্ডা বাহিনীকে। বীরভূমে তৃণমূলের কেষ্ট মণ্ডল পিটিয়ে, বোমা মেরে পঞ্চায়েত ভোটে জেতার কথা বুক বাজিয়ে বলে চলেছেন। পুলিশ, প্রশাসন দলদাস। তাই সবাই চুপ।

এত কথা বা ভূমিকার দরকার হচ্ছে কারণ, সম্প্রতি হয়ে যাওয়া গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনে ১৮২টি আসনের একটিতেও ছিটেফোঁটা হাঙ্গামা বা অশান্তি হয়নি। পরাজিত কংগ্রেস দল অথবা বিরোধীরা বুথ দখল বা পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একটিও অভিযোগ করেনি। মিডিয়া সাধারণভাবে বিজেপি বিরোধী। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সাংবাদিকরা বিজেপির বিরুদ্ধে এমন তথ্য পাননি যাতে বলা যায় যে রাজ্যের শাসকদল সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোটে জিতেছে। মমতা নবান্ন থেকে ঘোষণা করতে পারতেন যে বিজেপি মুসলমানদের ভোট দিতে দেয়নি। সেকথা বলতে পারেননি। অথচ মমতা প্রতিদিন নিয়ম করে বলেন যে বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ায়। গুজরাটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। এই রকম লড়াই পশ্চিমবঙ্গে হলে মহল্লায় মহল্লায় কত যে লাশ পড়তো তার ঠিক ঠিকানা নেই। কেষ্ট মণ্ডলরা বিরোধীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিত। গুজরাটে একটি বোমাও ফাটেনি। সকলে উৎসবের মেজাজে ভোট দিয়েছেন। অথচ এই অহিংস শান্তিপূর্ণ ভোটের কথাটা কলকাতার সংবাদমাধ্যম বিশেষভাবে তুলে ধরেনি। আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল তাঁর সাপ্তাহিক কলামে বিজেপি ২০১২-র তুলনায় ২০১৭-তে

গূঢ় পুরুষের কলম

আসন কম পেয়েছে বলে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। ঘোষণা করেছেন, গুজরাটের যুব সমাজের নেতা রাহুল গান্ধী। কলকাতার প্রতিটি খবরের কাগজ একটাই কথা লিখেছে যে গুজরাটে বিজেপির নৈতিক পরাজয় ঘটেছে। কেন? ১৮২ আসনের বিধানসভায় বিজেপির দখলে আছে ১০০টি আসন। সরকার গড়তে প্রয়োজন ৯২টি আসনের। তবু কলকাতার সাংবাদিকদের সমবেত হুক্কাহুয়া ডাক শুনে মনে হয়েছে যে নবান্নের দিদি বলেছেন যে নৈতিক পরাজয় হয়েছে সেটাই সত্যি। বাস্তবে যা ঘটেছে তা সত্য নয়।

এবার বাস্তবটা ঠিক কী দেখা যাক্। গুজরাটে বিজেপির পক্ষে ভোট সুইং হয়েছে প্রথম পর্বে ২.৫ শতাংশ। দ্বিতীয় পর্বে ১.৮ শতাংশ। এস টি আসনে ভোট বৃদ্ধি হয়েছে ৬ শতাংশ। এস সি এবং ওবিসি আসনে বৃদ্ধি হয়েছে ১ শতাংশ। ২ শতাংশ বেড়েছে উচ্চবর্ণের আসনে। আর ২ শতাংশ বেড়েছে প্যাটেল আসনে। ৫৯টি শহুরে কেন্দ্রে বিজেপির ভোট সুইং + ১.১ শতাংশ (সূত্র : নির্বাচন কমিশন)। হ্যাঁ, একথাও স্বীকার করতে হবে যে গ্রামীণ গুজরাটের ১২৩টি আসনে তুলনামূলকভাবে বিজেপির ফল ভাল হয়নি। বিজেপি আগে জেতা ১৫টি আসন হারিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল হয়েছে রাজ্যের সৌরাষ্ট্রে। এর কারণ, কার্পাস তুলোর চাষিদের বাস সৌরাষ্ট্রে। বহু আবেদন নিবেদন করেও মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন সৌরাষ্ট্রের তুলো চাষিরা। সঙ্ঘ পরিবার থেকে গত তিন বছর ধরে গুজরাট সরকারকে গ্রামীণ বিকাশের উপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আনন্দীবেন বা পরে রূপানী সরকার সেই পরামর্শে কান দেয়নি। নরেন্দ্র মোদী যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন নিরন্তর রাজ্য সফর করতেন। জেলা শাসকদের জেলার প্রতিটি গ্রামে উপস্থিত থেকে অভাব অভিযোগ শুনতে হতো। তাঁদের সাপ্তাহিক রিপোর্ট লিখতে হতো কোন কোন গ্রাম তাঁরা সফর করেছেন। চাষিদের চাহিদা বা সমস্যাগুলি কী কী। গান্ধীনগর থেকে প্রশাসন চালাননি মোদীজী। অন্যদিকে, বিজয় রূপানী জানতেন না অথবা গুরুত্ব দেননি যে সৌরাষ্ট্রের তুলোর দাম ৭০০ টাকা কুইন্টাল থেকে নেমে ৩০০ টাকা হয়ে গেছে। দাম পড়ে যাওয়ায় চাষিরা কার্পাস চাষ বন্ধ করে দিয়েছেন। ঠিক এই কারণে বিজেপির যে ১৫টি আসন কমেছে তার ১৩টি সৌরাষ্ট্রে।

আমরা আশা করবো যে সৌরাষ্ট্র থেকে বিজেপি শিক্ষা নেবে। বুঝবে যে দলীয় সংগঠন যতই মজবুত আর শক্তিশালী হোক না কেন চাষি মার খেলে ভোট দেবে না। সঙ্ঘের প্রচারকরা দক্ষ সংগঠক। তাঁরা গ্রামে গ্রামে যান। সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগ রাখেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা রূপানী সরকার শেয়ার করলে উপকারই হবে। ভুল শুধরে নেওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে শুধু গুজরাট কেন, ভারতের প্রাণভোমরা বাস করে গ্রামে। কৃষির উন্নয়ন না হলে যথার্থ বিকাশ হয় না। হতে পারে না। ■

রাহুলের জাতপাতের রাজনীতি দেশকে এক সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

গত তিনমাস ধরে চলা নানাবিধ জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে গুজরাটে পঞ্চমবারের জন্য সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপি। পর পর পাঁচবার একটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে গরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গড়তে পারা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের। বলতেই হবে সেই কৃতিত্বের অধিকারী বিজেপি হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে এও বলতে হবে, বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের আশা পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি গুজরাটে। অমিত শাহ বলেছিলেন, গুজরাটে বিজেপি ১৫০টি আসন দখল করবে। অর্থাৎ গুজরাটে কংগ্রেসকে একদম দুরমুশ করে দিয়ে বিজেপি তার বিজয়রথ অব্যাহত রাখবে— এমনটিই ভেবেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। কিন্তু ভোটের ফল বেরোবার পর দেখা গেল সরকার গঠন করার গরিষ্ঠতা বিজেপি অর্জন করলেও অমিত শাহের স্থির করে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রার অনেক আগেই থেমে যেতে হয়েছে বিজেপিকে। গুজরাটে বিজেপি দখল করেছে ৯৯টি আসন। অন্যদিকে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় এবার যথেষ্টই ভালো ফল করেছে। ৭৭টি আসন দখল করেছে কংগ্রেস। আসনসংখ্যার নিরিখে বিজেপির থেকে কংগ্রেস যে খুব একটা পিছিয়ে আছে এমন কথা বলা যাবে না। তবে, প্রাক্-নির্বাচনী প্রচারপর্বে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী বারবার দাবি করেছিলেন— গুজরাটে এবার কংগ্রেস সরকার গড়বেই। ফল বেরোলে দেখা গেল, সরকার গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় আসন সংখ্যার বেশ কিছুটা আগেই কংগ্রেসের দৌড় থেমে গেল। কংগ্রেস সভাপতির আশা পূর্ণ হলো না। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে— বিজেপি সভাপতি এবং কংগ্রেস সভাপতি কারোর আশাই পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি গুজরাটের নির্বাচনে।

আসনসংখ্যার নিরিখে যদি গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে অনেকেই বলবেন— গুজরাটে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যথেষ্ট ভালো ফল করেছে। ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধীর বাজনদাররা সেরকম বলতেও শুরু করেছেন। কেউ কেউ তো অতি উৎসাহে এমনও বলতে শুরু করেছেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেই রাহুল গান্ধী বিজেপিকে বিদায় জানিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধীকে দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন কেউ কেউ। কিন্তু যদি গুজরাট নির্বাচনে কংগ্রেসের এই ফলের পিছনে রাহুল গান্ধীর কৃতিত্ব কতটা তা নিয়ে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করা যায়— তাহলে হতাশ হতেই হবে। মনে রাখতে হবে, গুজরাটে দু-দশকের বেশি সময় বিজেপি সরকারে রয়েছে। তৎসত্ত্বেও বিজেপির প্রাপ্ত ভোট শতাংশের হার এবার কমেনি। এটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, দু-দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকলে কিছুটা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়। সরকারকে কেন্দ্র করে মানুষের মনেও কিছুটা ক্ষোভ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। গুজরাটে বিজেপি সরকারকে কেন্দ্র করেও তা হয়েছিল। সেই ক্ষোভ কোথাও কোথাও প্রকাশ হয়েও পড়েছিল। তৎসত্ত্বেও বিজেপির প্রাপ্ত ভোট শতাংশ গতবারের তুলনায় কমেনি। বরং গতবারের তুলনায় এবার ভোট শতাংশ বেড়েছে। টানা চারবার সরকারে থাকার পরও যে ভোট শতাংশ বাড়ানো যায় বিজেপি তা দেখিয়েছে গুজরাটে। এতে কী প্রমাণ হয়? এতে এটাই প্রমাণ হয়— কিছু ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকলেও গুজরাটের ভোটদাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কিন্তু বিজেপিতেই ভরসা রেখেছেন। রাহুলে নয়। মনে রাখতে হবে, এবার গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারপর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংস্কার এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মকে আক্রমণ করে, ব্যঙ্গ করে জোর প্রচার চালিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। গুজরাটে বিজেপিকে হারাতে জাতপাতের জঘন্যতম রাজনীতিটি করতেও দ্বিধা করেননি তিনি। এতদ্‌সত্ত্বেও বিজেপিকে কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেননি তিনি। বিজেপি পঞ্চমবারের জন্য গুজরাটে সরকার গড়ছে। এতসব আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়েই বিজেপি তার ভোট শতাংশ বাড়িয়ে নিয়েছে।

> **জাতপাতের ঘৃণ্য রাজনীতিকে আশ্রয় করেই হার্দিক প্যাটেল, জিগ্নেশ মেভানি এবং অল্পেশ ঠকরে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, এঁদের এই জাতপাতের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়েই রাহুল গান্ধী গুজরাটে ক্ষমতা দখল করার স্বপ্ন দেখেছিলেন।**

অতএব, রাহুল গান্ধীর বাজনদাররা যতটা উল্লসিত হচ্ছেন— ততটা উল্লসিত হওয়ার কারণ বোধহয় নেই।

আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। শতবর্ষেরও বেশি প্রাচীন কংগ্রেস দলটি কিন্তু একক শক্তিতে বিজেপির মোকাবিলা করতে পারেনি। করার সাহসও দেখায়নি। গুজরাট নির্বাচনে হার্দিক প্যাটেল, জিগ্নেশ মেভানি, অল্পেশ ঠকরেদের মতো জাতপাতভিত্তিক নেতাদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়েছে রাহুল গান্ধীকে। খ্রিস্টান মিশনারিরা তাদের ধর্মপ্রচারকের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে রাহুল গান্ধীকে জেতানোর জন্য আবেদন জানিয়েছেন। অন্যদিকে বিজেপি একা, নিজের শক্তিতে এদের সকলের মোকাবিলা করেছে এবং জিতেছে। গুজরাটের নির্বাচনী ফলাফলে এটা প্রমাণ হয়েছে যে, একক শক্তিতে বিজেপিকে মোকাবিলা করার অবস্থায় এই মুহূর্তে কংগ্রেস তো বটেই, অন্য কোনো বিরোধী দলও নেই। সম্মিলিতভাবে বিজেপিকে মোকাবিলা তারা করতে পারবে কিনা— সে নিয়েও অবশ্য সংশয় রয়েছে। কাজেই যতটা উল্লাস করছেন রাহুল গান্ধীর বাজনদাররা, অতটা উৎসাহ তারা প্রকাশ না করলেই ভালো করবেন।

এই সত্য রাহুল গান্ধীর বাজনদাররা স্বীকার করতে চাইবেন না। তাঁরা এরপরও রাহুল গান্ধীর মহিমা প্রচারেই ব্যস্ত থাকবেন। সে তারা থাকুন গিয়ে। কিন্তু এবার গুজরাট নির্বাচনে যা হলো তার একটি মারাত্মক বিষময় ফল রয়ে গেল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সৌজন্যে অদূর ভবিষ্যতেই সমগ্র দেশকে সেই বিষের জ্বালায় জর্জরিত হতে হবে। কী সেই বিষটি? রাহুল গান্ধী এবারের নির্বাচনে গুজরাটে যে তিন তরুণ নেতার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, তাঁরা হলেন হার্দিক প্যাটেল, অল্পেশ ঠকরে এবং জিগ্নেশ মেভানি। এই নির্বাচনে গুজরাটে এই তিন নেতাই গুজরাটে পায়ের তলায় রাজনৈতিক জমি পেয়েছেন— একথা অস্বীকার করা যাবে না। বরং বলা যায় গুজরাটের ভোটে রাহুল গান্ধীর যেটুকু রমরমা হয়েছে— তা এই তিন নেতার সৌজন্যে। এখন প্রশ্ন হলো— এই তিন নেতা কী রাজনীতি করেন? কোনো নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদী রাজনীতি? না, একেবারেই না। এই তিন নেতারই রাজনীতির হাতিয়ার হলো জাতপাতের অতি ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় রাজনীতি। যে জাতপাত ভারতীয় সমাজের এক অভিশাপ, এক কলঙ্ক, যে জাতপাত ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজকে চিরকাল পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে— সেই জাতপাতের ঘৃণ্য রাজনীতিকে আশ্রয় করেই হার্দিক প্যাটেল, জিগ্নেশ মেভানি এবং অল্পেশ ঠকরে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, এঁদের এই জাতপাতের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়েই রাহুল গান্ধী গুজরাটে ক্ষমতা দখল করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অবশ্য কংগ্রেসের এই চরিত্র নতুন নয়। কংগ্রেস চিরকালই জাতপাতে হিন্দু সমাজকে বিভাজন করে মুসলমান তোষণের রাজনীতিতে ব্যস্ত থেকেছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই জাতপাতের রাজনীতিকে পর্যুদস্ত করে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে। ২০১৫-য় বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে লালুপ্রসাদ ওই জাতপাতের রাজনীতি করেই ফায়দা লুটেছিলেন। তবে, ২০১৬-য় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে এই জাতপাতের রাজনীতি আবার পর্যুদস্ত হয়েছিল। মায়াবতী, লালুপ্রসাদ, মুলায়মের মতো জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতিকরা ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন।

গুজরাটের নির্বাচনে কিছুটা সাফল্য লাভের পর এই জাতপাত ভিত্তিক তরুণ নেতারা পুর্ণোদ্যমে জাতপাতের রাজনীতি করতে নেমে পড়বেন। এদের এই জাতপাতের রাজনীতি যে শুধু গুজরাটকে অশান্ত করবে তা নয়, অন্যান্য রাজ্যেও মায়াবতী, লালুপ্রসাদের মতো জাতপাতভিত্তিক নেতারা উৎসাহী হবেন। তাঁরাও আবার জাতপাতের তাস হাতে নিয়ে বাজারে নেমে পড়বেন। যে জাতপাতের রাজনীতিকে অপাংক্তেয় করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল— সেই ঘৃণ্য রাজনীতিটিই আবার ফিরে আসবে। এতে দেশ এবং দশ কারোরই মঙ্গল হবে না। বরং উন্নত ভারত গড়ার পক্ষে এরা অন্তরায় সৃষ্টি করবে। রাহুল গান্ধীর বাজনদাররা একবার ভেবে দেখবেন— রাহুলের রাজনীতি আদৌ ভারতের উপকার করল, নাকি এক সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে গেল ভারতবর্ষকে?

তবে, গুজরাটের এই নির্বাচনের ফলাফল থেকে বিজেপিকেও কিছু শিক্ষা নিতে হবে। এই নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগেই নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে হবে বিজেপিকে। পঞ্চমবারের জন্য গুজরাটে সরকার গড়ার আনন্দে আত্মতৃপ্তিতে ভুগলে বিজেপি ভুল করবে। এবারের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, শহরাঞ্চলে বিজেপি যতটা ভালো ফল করেছে, ততটা ভালো ফল গ্রামাঞ্চলে করতে পারেনি। তুলনায় গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস এবং তার সহযোগীরা ভালো ফল করেছে। স্পষ্টত বোঝাই যাচ্ছে, বিজেপির প্রতি গ্রামীণ মানুষের ক্ষোভ কিছু রয়েছে। এই ক্ষোভের কারণটি বিজেপিকে অনুসন্ধান করতে হবে। ক্ষোভের যথার্থতা বুঝতে হবে। ক্ষোভটি যদি যথার্থ হয়, তার প্রতিকারের পন্থাও খুঁজতে হবে। সারা দেশেই কৃষকদের ভিতর ক্ষোভের আঁচ কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের নীতিতে কোথাও যদি গলদ থাকে, তা সংশোধন করে এই ক্ষোভ যতশীঘ্র সম্ভব প্রশমিত সরকারকেই করতে হবে। আর যদি বিরোধীদের কুৎসা এবং অপপ্রচার কৃষক সমাজকে প্রভাবিত করে থাকে, তবে তারও যোগ্য জবাব বিজেপিকেই দিতে হবে। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাস করেন গ্রামে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি নজর না দিলে তার বড়ো মাশুল গুনতে হতে পারে ভবিষ্যতে। এই বছরই বিজয়া দশমীর ভাষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতও এই গ্রামীণ ভারতের দিকে নজর দিতে বলেছেন। ২০১৯ সালের আগে বিজেপি যত তাড়াতাড়ি এই কাজটি করতে পারবে, ততই তাদের জয়ের পথ সুগম হবে। গুজরাট নির্বাচন এই বার্তাটিই দিয়ে গিয়েছে বিজেপিকে। ■

গুজরাট কঠিন জায়গা, ছদ্মবেশী 'শিবভক্ত'রা বুঝেছেন

তরুণ বিজয়

এবারের গুজরাট নির্বাচন শুধু একটি রাজ্যের নির্বাচন না হয়ে বহু প্রশ্নের উত্তর হিসেবে আমাদের কাছে উঠে এসেছে। বাংলা মিডিয়া তো ছার, জাতীয় মিডিয়ার একটি বড় অংশ প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিল গুজরাট অসুখী, গুজরাট মডেল ডাহা ফেল। মিথ্যা অভিযোগ, অসত্য তথ্য, ইসরাত জাহানের মতো সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করে জাতপাত ভিত্তিক সংগঠনগুলিকে চাগিয়ে তোলা থেকে শুরু করে ব্যক্তি আক্রমণ— কোনও কিছুই বাদ যায়নি। লক্ষ্য একটাই— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অযোগ্য প্রমাণ করতে হবে। কিছু মিডিয়া তো একে জাতীয় জনমত সংগ্রহের মর্যাদা দিয়ে বসে। যেন ২০১৪ থেকে ২৭টি নির্বাচন জয়ী প্রধানমন্ত্রীকে গুজরাট নির্বাচনে হারলে ইস্তফা পত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতিভবন ছুটতে হতো।

কিন্তু গুজরাটের জনতা এই ছদ্মবেশী 'মন্দির, শিবভক্ত, পৈতাধারী'দের এক বাক্যে হাত জোড় করে বলেছে 'জয় সোমনাথ'। অর্থাৎ আসছে বছর দেখা যাবে। গুজরাটকে নিয়ে যে অপপ্রচার, যে কুৎসা শুরু হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নিজে বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে তাকে প্রতিহত করেছেন। এজন্য তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ, তার জাতি, তার পারিবারিক পেশা নিয়েও ঠাট্টা ইয়ার্কিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তুলে আনা হয়েছে তার বাবা-মা'র নামও। কিন্তু রাজ্যে বিজেপির ২২ বছরের উন্নয়ন, মোদীর ব্যক্তিত্ব, অমিত শাহের কর্মকুশলতা, সবচেয়ে বড় কথা রাজ্যে বিজেপির কার্যকর্তাদের পরিশ্রম সমস্ত অপপ্রচারের আক্রমণ ভোঁতা করে দিয়েছে। এটা ঠিক যে বিজেপির বিধানসভায় আসন সংখ্যা গতবারের চেয়ে কমেছে, কিন্তু এটাও বলতে হবে দলের ভোট শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৪৯.১০ শতাংশ অর্থাৎ কংগ্রেসের চেয়ে ৭.৬১ শতাংশ বেশি।

বিরোধী শিবির ও তার তাঁবেদার সংবাদমাধ্যমগুলি নির্বাচনে বিজেপির মূল হাতিয়ার উন্নয়ন, তোষণবিহীন সমাজ, শিল্পে উন্নতি, কৃষিতে উন্নতি-এর মতো বিষয়কে পাশে রেখে শুধু কংগ্রেসি জমানার শেষ নিদর্শন জাতপাত, ধর্মীয় তোষণ, মৌলবি, পাদরিদের ফাতোয়া, সংরক্ষণের দাবিকে সম্বল করে লড়ে গেল। যেভাবে অসত্য তথ্য পরিবেশন, নোংরা জাতপাতের রাজনীতি, ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত কুৎসা, এমনকী পাকিস্তান কানেকশনকেও মাঠে নামাতে আমরা দেখলাম। এ যেন সত্যের বিরুদ্ধে অসত্যের মায়াজাল।

কিন্তু বিরোধীরা ভুলে গিয়েছিল তাদের সামনে রয়েছে মোদী-শাহের জুটি, কার্যকর্তাদের বিরাট টোলি, সবচেয়ে বড় কথা একটি আদর্শ। প্রধানমন্ত্রীর এক লক্ষ কিলোমিটারের বেশি গুজরাট ভ্রমণ, ৪৪টি রোড শো, প্রায় সমান সংখ্যক জনসভা, বুথস্তরের কার্যকর্তাদের সঙ্গে সভাপতির সরাসরি যোগাযোগ, সারা দেশের সাংসদ, বিধায়ক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের আনাগোনা বিরোধীদের মায়াজাল ছিন্ন করে দেয়।

গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন : এক নজরে একটি বিশ্লেষণ

ভোটের পার্থক্য	বিজেপি জিতেছে	কংগ্রেস জিতেছে
৫০০-র নীচে	১	১
৫০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে	১	৩
১০০০ থেকে ২০০০-এর মধ্যে	৬	৪
২০০০ থেকে১০০০০-এর মধ্যে	১৮	২৮
১০০০০ থেকে ২০০০০-এর মধ্যে	১৭	২৪
২০০০০ থেকে ৩০০০০-এর মধ্যে	১৪	১২
৩০০০০ থেকে ৪০০০০-এর মধ্যে	৭	৪
৪০০০০ থেকে ৫০০০০-এর মধ্যে	১৫	—
৫০০০০ থেকে ৬০০০০-এর মধ্যে	৮	১
৬০০০০ থেকে ৭০০০০-এর মধ্যে	৫	—
৭০০০০ থেকে ৮০০০০-এর মধ্যে	৩	—
৮০০০০ থেকে ৯০০০০-এর মধ্যে	২	—
৯০০০০ থেকে ১০০০০০-এর মধ্যে	২	—
মোট	৯৯	৭৭
সব থেকে কম পার্থক্য	কাপরাদা আসনে মাত্র ১৭০ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস জয়ী	
সব থেকে বেশি পার্থক্য	চোরায়াসি আসনে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৫০ ভোটে বিজেপি জয়ী	

প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন এ নির্বাচন শুধু একটি রাজ্যের নির্বাচন মাত্র নয়, বরং উজ্জ্বল, উন্নত, শক্তিশালী ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে পরিবারতান্ত্রিক কংগ্রেসের শেষ লড়াই। এ লড়াই গৌরবময় ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে জাতি, ধর্ম, প্রাদেশিকতায় বিভাজিত, গণরাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নব যুবরাজদের।

তাই বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে রাহুল-সোনিয়া, লালু-তেজস্বী, মুলায়ম-অখিলেশ, মমতা-অভিষেক, করুণানিধি-কানিমোজী, শরদ পাওয়ার, উদ্ধব, ফারুক সবাই এক গোত্রের। এই লড়াইয়ে ভারতীয় জনতাপার্টির হয়ে লড়েছে অজানা অচেনা কার্যকর্তাদের ফৌজ। তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন গুজরাটে ক্রমাগত উন্নয়নের কাহিনি, দুনিয়ার সবচেয়ে নোংরা নদী সবরমতীকে ঝকঝকে তকতকে করে তোলার চিত্র, শিল্পের উন্নয়ন থেকে শুরু করে কেন্দ্রের কংগ্রেসি সরকারের বিরুদ্ধে লড়ে নর্মদার বাঁধ তৈরির কঠিন সংগ্রামের কাহিনি। জাতপাতের ভেদাভেদে দীর্ণ গুজরাটকে হিন্দুত্বের সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে গত তিন বছরের দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, যুগ যুগ থেকে অন্ধকারচ্ছন্ন এলাকায় 'উজালা' বা বিদ্যুৎবাতি, গরিবের ঘরে সস্তা রান্নার গ্যাস সংযোগ, মুদ্রা ব্যাঙ্ক, কৌশল যোজনা মানুষকে আত্মবিশ্বাসে জুগিয়েছে। তবে তারা কেন দুর্নীতির কয়লার কালো জীজাজী দুজীদের কমনওয়েলথ খেলা দেখবে? একথার জবাব কিন্তু মিডিয়া জগৎ দেয়নি। কিন্তু গুজরাট হিমাচলের জনতা দিয়েছে। এজন্য তাদের ধন্যবাদ।

(লেখক রাজ্যসভার ভূতপূর্ব সাংসদ)

বিশেষ প্রবন্ধ

ভারতীয়ত্বে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতৃত্বের আরও সচেতনতা চাই

দেবী প্রসাদ রায়

স্বাধীনতার সাতষট্টি বছর পর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত জনসঙ্ঘ পরিবর্তিত নামে একান্তভাবে এখন স্বনির্ভর হয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করে প্রকৃত অর্থে ভারতের জাতীয় সরকার গঠন করেছে। ভারতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি এতদিন অভাবনীয় ধারণা সমূহের চাপে অবদমিত হয়েই চলে আসছিল। এই প্রথম সুযোগ এল স্তূপীকৃত মালিন্য, হীনমন্যতার বোঝা সরিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি আলোকিত প্রশাসন এবং সে ভাবেই সংস্কৃত এক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার। ব্রিটিশ-গান্ধী নকশামতো প্রতিষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অবিমৃষ্যকারিতায় পঙ্গু থেকে পঙ্গুতর হয়ে যাওয়া বৈদেশিক নীতির যথোপযুক্ত পরিবর্তন দরকার ছিল, তা হয়েছে। ডোকলাম সংকট নিরসনে যে প্রজ্ঞা, যে দৃঢ়তা দেখিয়েছে ভারতীয় প্রশাসন তাতে এতদিন ধরে মাথা হেঁট হয়ে থাকা দেশবাসী আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। অনুসৃত অর্থনীতিতে বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষিতে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধির তাগিদে যে পরিবর্তন প্রার্থিত ছিল তার জন্য সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিমুদ্রীকরণ এবং পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) প্রবর্তনের মতো বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়ে গড্ডলিকাপ্রবাহের বাইরে আসার চেষ্টা করা হয়েছে পুরানো চলমান জাড্য কাটিয়ে। গোটা বিশ্বে এ নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেছে যেমন, তেমনই অনেক বেশি মাত্রায় হয়েছে দেশের মধ্যে, মৌরসিপাট্টার অবসানে ভয়চকিত কায়েমি-স্বার্থ ও রাজনৈতিক নেতাদের দিক থেকে।

তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে নেওয়া হয়েছে শিক্ষানীতির ভারতীয়করণের প্রয়াস। দীর্ঘকাল অনুসৃত অভাবনীয় ধারণা সমূহের ভারে নুয়ে পড়া শিক্ষানীতিকে নির্ভেজাল ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকে উদ্ভাসিত করা ও সুস্থ করে তোলাই অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণ মানুষ অতীত অভিজ্ঞতা সমূহের পটভূমিকার দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যেও প্রাথমিক উদ্যোগগুলির দর্শনকে গ্রহণ করেছিল এবং সর্বতোভাবে সরকারকে সহায়তা করার মানসিকতা বহন করেছে শুধু নয় অনেক বাস্তব অসুবিধের মধ্যেও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে আনুপাতিক সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশাসনিক সক্রিয়তার জন্য।

এখন শাসকদলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার মধ্যে রাজনীতি ঘোরাফেরা করে। ফলে কানাগলির মধ্যে পথ হারিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে দেখতে পায় না এবং দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধনও বাস্তবে সম্ভব হয় না। ফলে অলক্ষ্যেই পতনের বীজ প্রথমে ধীরে এবং পরে দ্রুতগতিতে অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং সুব্রহ্মনিয়ম স্বামীর বক্তব্য গুরুত্ব পাবে বলে মনে হয় না এবং এখানেই আছে অশনি সংকেত।

একটা জাতি দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হয় তার প্রকৃত ইতিহাস সম্যক ভাবে জেনে— বিশেষ করে ভারতে যার এক অতি গৌরবময় বিশ্ব স্বীকৃত সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আছে। দেশের সামগ্রিক ইতিহাস-সহ কিছু কিছু রাজ্যের বা অঞ্চলের ইতিহাস দিনের পর দিন অজানা থেকেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল প্রাক্তন কংগ্রেসি সরকার, অসমের স্বাধীন অহোম রাজাদের ইতিহাস আমরা কজন জানি ভারতবাসী হিসেবে। পাঠ্য ভারতের ইতিহাসে রাজ্যগুলির ইতিহাস তো থাকা উচিত— এটি কি যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে?

আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত না থাকার জন্যই কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান দূরে সরে যাচ্ছে। কাশ্মীর পরিপূর্ণভাবে হিন্দু অধ্যুষিতই ছিল, হিন্দু সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের বাস ছিল কাশ্মীর বা কাশ্যপপুর— এককালের ‘প্রবরপুর’। তিব্বতের নিজস্ব ভাষা, লিপি এই পণ্ডিতদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। সারদা লিপিতে কলহনের ‘রাজতরঙ্গিনী’ লেখা হয় কাশ্মীরেই। কাশ্মীরে রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের সাম্রাজ্য তিব্বত ছাড়িয়ে মঙ্গোলিয়া অবধি বিস্তৃত ছিল। তিব্বতে ২০০০ বছরের ইতিহাসে চীনের আধিপত্য আসে অত্যন্ত সাময়িকভাবে তার কিছু অংশের ওপর। তিব্বত চীনের অধীনস্থ ছিল বলে নেহরু বিবৃতি দেন, কখনো ললিতাদিত্যর নাম শোনা গেছে তাঁর বিবৃতিতে? কীভাবে কাশ্মীর জোর-জবরদস্তি ধর্মান্তরণের শিকার হলো— বর্তমান প্রজন্মের কাশ্মীরে যুবাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস জানানোর ব্যবস্থা আছে? কীভাবে তাদের বিগত প্রজন্ম অত্যাচারিত হয়েছে উপজাত পাকিস্তান প্রেরিত মুসলমান উপজাতি দ্বারা, কীভাবে তাদের উচ্চমানের ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক আদর্শের অবনমন হয়েছে যে ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে? সামরিক ব্যবস্থাদির পাশাপাশি কাশ্মীরি যুবকদের কাছে কি সাংস্কৃতিক প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরা হয়? সে চেষ্টার ছিটে ফোঁটাও হয়েছে কী? বর্তমান ভারত সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কি এ নিয়ে?

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু নিয়ে হৈচৈ হয় মাঝে মাঝে। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য নিয়ে তদন্ত দাবি করে কোনো আন্দোলন হয়েছে? শেখ হাসিনা যদি এত বছর পরে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে পারে, কিন্তু এখনও বিজেপি সরকার সে পথে হাঁটেনি। মিথ্যা আর্য আক্রমণতত্ত্ব ভারবহ হয়ে চেপে আছে আমাদের ইতিহাসের পাঠক্রমে। ইউনেস্কোর আর্থিক অনুদানে ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক লিওনার্ড উলে লিখিতভাবে ম্যাক্স মুলারের আর্য আক্রমণ তত্ত্বকে ‘হিস্ট্রি অব ম্যানকাইন্ড’ গ্রন্থ ধারাবাহিকে পাকাপাকি ভাবে ঠাঁই করে দিয়েছে। বহু গবেষণা, গ্রন্থসাক্ষ্য, উপগ্রহ চিত্র সাক্ষ্য-বৈজ্ঞানিক বিশদ বিশ্লেষণ— সবই ওই তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিলেও ওই গ্রন্থের জন্য তা বিশ্বস্বীকৃতি পাচ্ছে না, এর জন্য ইউনেস্কোতে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ-সহ প্রতিনিধি দল পাঠানোর জন্য আবেদন করেছিলাম মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে তার কোনো প্রতিক্রিয়া আজ অবধি জানতে পারেনি। দেশের মধ্যে আর্য আক্রমণতত্ত্ব নিয়ে বক্তৃতাবাজি বা লেখনী আস্ফালন সাজে কী? অথচ জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে বসে আছে ভারতবাসী।

‘আন্তর্জাতিক যোগ দিবস’ পালনের প্রাক্কালে ভারতীয় দূরদর্শন ও গণমাধ্যমে বলা হলো ‘যোগ’ সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে প্রচলিত আছে পরে বৈদিক সভ্যতার সময়েও তা অনুসৃত হয়েছে অর্থাৎ আর্য আক্রমণ তত্ত্বর সমর্থনকারী মার্ক্সিস্ট ঐতিহাসিকদের বক্তব্যই তুলে ধরা হলো। এই স্ববিরোধিতাই চলছে এই জাতীয় সরকারের আমলেও এবং স্বচ্ছন্দে! এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলাপ আলোচনা, ব্যবস্থা গ্রহণ অনেক কিছু করার আছে ভারতীয়ত্বে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতৃত্বের। তাই রাষ্ট্রীয় নেতারা ভাবুন।

গুজরাট নির্বাচন : ৮০ শতাংশ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

দিল্লিতে ক্ষমতা দখলের কথা উঠলেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়শই ফেডেরাল ফ্রন্টের নাম করেন। এই ফ্রন্টের অন্যতম স্তম্ভ হলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দল আম আদমি পার্টি। গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনে আপ উনত্রিশজন প্রার্থী দিয়েছিল। তাদের সকলেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। গুজরাটের জনমানসে তারা কোনও প্রভাবই বিস্তার করতে পারেননি। বস্তুত, দলের যে এই দশা হতে চলেছে সেটা আপের শীর্ষনেতারা আগাম অনুসান করতে পেরেছিলেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ শিশোদিয়া, শ্রমমন্ত্রী ও রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত গোপাল রাই প্রমুখ শীর্ষনেতাদের গুজরাটে দলের প্রচারে দেখা যায়নি। কেজরিওয়াল দিল্লিতে বসেই পতিদার সংরক্ষণ ইস্যু নিয়ে গরম-গরম মন্তব্য করে হাওয়া ঘোরাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেসব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। মানুষ সাড়া দেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোয়ার পর আপের এটি দ্বিতীয় নির্বাচনী বিপর্যয়।

এবারে গুজরাটে যাঁরা প্রার্থী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আশি শতাংশের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, এবারে গুজরাটে ১,৮২৮ জন প্রার্থী ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৪৪৪ (৮০ শতাংশ) জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর আগে ১৯৯৫ সালে এরকম হয়েছিল। সেবার ২৫৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১২৭ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তারও আগে ১৯৯০ সালে ১৮৮৯ জনের মধ্যে ১৪৬১ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া প্রার্থীরা সকলেই হয় বিএসপি, আপ এবং এনসিপি দলের প্রার্থী, নয়তো নির্দল প্রার্থী। বিজেপি এবং কংগ্রেসের কোনও প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়নি।

বিশেষ প্রতিবেদন

দাদু পার্সি, ঠাকুমা মুসলমান, মা খ্রিস্টান, রাহুল কিন্তু 'উপবীতধারী ব্রাহ্মণ'

রঞ্জন কুমার দে

শেষ হলো দেশের সবচেয়ে হেভিওয়েট রাজ্য গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচন। ২০১৪ সালের হিন্দুত্বের ছোঁয়া এইবারের গুজরাটের রাজনীতিতেও দেখা গেলো, তবে এবার রাহুল গান্ধীর হাত ধরে। ২০০২-এর 'দাঙ্গা'র রাজ্যে রাহুল একবারও উচ্চারণ করলেন না সাম্প্রদায়িকতার। কংগ্রেসের যুবরাজ আগাম আঁচ করতে পেরেছিলেন সেকুলারিজমের নামে কোনও বিশেষ ধর্ম বা গোষ্ঠীকে তোষামোদ করলে চলবে না। তাই কপালে তিলক চন্দন লাগিয়ে অন্তত তিরিশটি মন্দিরে চক্কর কেটেছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় রাজনীতিতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। হিন্দুভোট একজোট হতে শিখেছে। তাইতো মমতা ব্যানার্জীর মতো হিন্দু বিমুখ ব্যক্তিত্ব পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে সগৌরবে ঘোষণা করেছেন, 'আমি সবচেয়ে বড় হিন্দু'। রাহুল গান্ধী যখন হিন্দু ভোট পেতে মরিয়া, বিপত্তি ঘটে সোমনাথ মন্দিরে।

গত ২৯ নভেম্বর রাহুল গান্ধী গুজরাটের সোমনাথ মন্দির দর্শনে যান। মন্দিরের নিয়মানুসারে হিন্দু এবং অহিন্দু পরিদর্শকদের জন্য আলাদা করে কসেন্টবুকের ব্যবস্থা রাখা আছে। গুজরাট রাজ্য রাজনীতিতে তুফান এসে যায় যখন প্রকাশ পায় অহিন্দু পরিদর্শক রেজিস্টারে জুনিয়র গান্ধীর নাম রয়েছে। গোটা কংগ্রেস টিম লেনার চেয়ে দেনাতে পড়ে যায়। বিজেপি পেয়ে যায় রাজনীতি করার ব্রহ্মাস্ত্র এবং কংগ্রেসের পুরানো বেফাঁস মন্তব্য প্রকাশ করার প্রাসঙ্গিকতা। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন, 'By education I'm an Englishman, by views an internationalist, by culture a Muslim and I'm a Hindu only by accident of birth.' তিনি হিন্দু সংস্কৃতিকে ভারতের স্বার্থবিরোধী বলেছিলেন। তিনি আরও মনে করতেন হিন্দু ধর্মের আদর্শকে যদি শিকড় বিস্তার করতে দেওয়া হয় ভারতে তাহলে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হবে। রাহুল গান্ধী ওই কংগ্রেসেরই উত্তরাধিকারী কিন্তু তিনি পুরোপুরি নেহরুর পথে হাঁটতে চান না। তাই রাহুল গান্ধী নিজেকে মহা শিবভক্ত এবং ইন্দিরা গান্ধীকেও শৈব বলে দাবি করেছেন। ইন্দিরা নাকি রুদ্রাক্ষ মালাও ব্যবহার করতেন।

গুজরাট বিধানসভার প্রথম পর্যায়ে রাহুল গান্ধীর দল অনেক এগিয়ে ছিল। ধারণা করা হচ্ছিল যুবরাজের হাত ধরেই গুজরাট পুনরুদ্ধার হবে। কিন্তু কংগ্রেসের কিছু দায়িত্বহীন মন্তব্যে ক্রমশ তাদের গতি ফিকা হতে দেখা গেছে। তার মধ্যে সোমনাথ মন্দিরের বিতর্কে হিন্দু ভোটে নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কায় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃত্ব ছিলেন ড্যামেজ কন্ট্রোলে ব্যস্ত। কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুর্যেওয়ালার দাবি রাহুল একজন পৈতেধারী ব্রাহ্মণ এবং গান্ধী পরিবারের অনেক পূজাপার্বণের ছবিও তিনি মিডিয়াকে দেখান। এর আগে ২০১২ সালেও নাকি রাহুল নিজের হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়েছিলেন। কপিল সিব্বাল কয়েক ধাপ এগিয়ে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী নাকি আসল হিন্দু নন, তাঁর ভাষায় হিন্দুত্বের সঙ্গে হিন্দুর কোনো সম্পর্ক নেই। আরেক কংগ্রেস নেতা রাজ বব্বর বলেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ নাকি জৈন। আন্তর্জাতিক মিডিয়া New York Times ১৯৮৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তাদের একটি প্রতিবেদনে লিখেছিল সোনিয়া মাইনো রোমান ক্যাথলিক। পত্রিকাটি সোনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাহুল, প্রিয়াঙ্কাকেও ক্যাথলিক বলেছিল। কিন্তু তিন দশক পেরিয়ে গেলেও কংগ্রেস কোনো আপত্তি জানায়নি। সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী দিল্লির দশ জনপথে একটি চার্চ আছে বলে দাবি করেন। রাহুল গান্ধী পারিবারিক দিক থেকেও রহস্যময় ধার্মিক পরিচয়ের আবর্তে। কারণ দাদু ফিরোজ জাহাঙ্গীর একজন পার্সি, ঠাকুরমা ইন্দিরা গান্ধী ওরফে মাইমুনা বেগম (মুসলমান), মা সোনিয়া গান্ধী ওরফে এন্তনিয়া মাইনো (খ্রিস্টান)। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে দিগ্গজ রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর কন্যা দিনা উয়াদিয়াও পার্সি বিবাহ করে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। কংগ্রেস আজ ঘর ওয়াপসির বিরুদ্ধে, কিন্তু সেদিন কী হয়েছিল যে নেহরু গান্ধী নিজের কন্যা এবং জামাতাকে ঘর ওয়াপসি করতে বাধ্য করেছিলেন।

সে যাই হোক, কংগ্রেস পরিবারের বিভিন্ন ধার্মিক কর্মকাণ্ডে রাহুলকে আজ রুদ্রাক্ষ পরিধান করে মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে প্রমাণ করতে হলো তিনি হিন্দু। কংগ্রেসের হিন্দুদের আরাধ্য রাম এবং কৃষ্ণের অস্তিত্বের সত্যতা নিয়ে আদালতে সওয়াল করেছিল। রাহুল গান্ধী গুজরাট নির্বাচনের বাহানায় মন্দির দর্শনে নিজেকে পৈতেধারী ব্রাহ্মণ বলে বারংবার প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করলেন, এটাই হিন্দুদের বাড়তি পাওনা।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

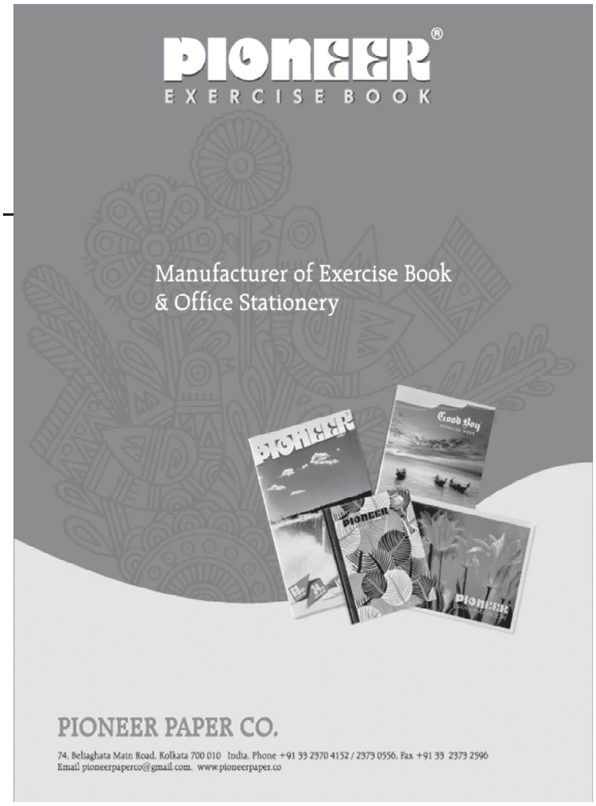

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

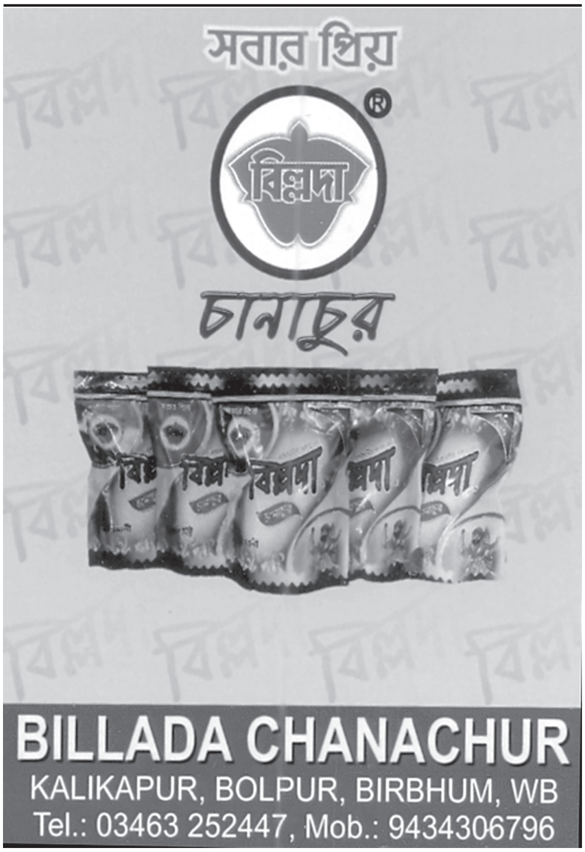

ভিলেনরা একজোট হলে নায়ককে লড়েই জিততে হয়

সন্দীপ চক্রবর্তী

দু’ দশক আগেও ভারতের দলীয় রাজনীতিতে বিজেপি ছিল অচ্ছুত। কিন্তু এখন এতটাই অভিজাত এবং শক্তিশালী যে কোনও একটি রাজ্য নির্বাচনে কয়েকটি আসন কম পেলে তা বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে কংগ্রেস পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে ভারত শাসন করার পরেও কয়েকটা আসন বেশি পেয়েছে বলে তাদের পরাজয় নৈতিক জয়ে পর্যবসিত হয়। সম্প্রতি রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। নির্বাচিত হয়েছেন বলা গেল না, কারণ আর কেউ মনোনয়ন পত্র দাখিল করেননি। কংগ্রেসের (মতান্তরে গান্ধী পরিবারের) অনুগত নেতারা বলতে শুরু করেছেন, নেতা হিসেবে রাহুল গান্ধী এমনই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী যে তিনি যদি কোনও নির্বাচনে সিরিয়াসলি প্রচার করেন তাহলে সেখানে কংগ্রেসের ফল ভালো হতে বাধ্য। তাদের মনের কথাটি হলো, রাহুলবাবা আর ছোটটি নেই। বড়ো হয়ে গেছেন। অতএব ভাইসব আনন্দ করুন।

তবে রাহুলের কৃতিত্ব একেবারেই নেই, একথা কিন্তু বলা যাবে না। নিঃসন্দেহে তিনি গুজরাটে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের আত্মপ্রসন্ন হয়ে পড়া একটি অংশকে কোমর বেঁধে মাঠে নামতে বাধ্য করেছেন। কংগ্রেস ও হার্দিক-জিগনেশ-অল্পেশ ত্রয়ীর জাতপাতভিত্তিক রাজনীতি, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা এবং জিএসটি-কে কেন্দ্র করে গুজরাটি সমাজের একাংশের ক্ষোভ ইত্যাদি কারণে এবারে বিজেপি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। মিডিয়া সেই সুযোগে রাহুল গান্ধীকে প্রমোট করার কাজ শুরু করে।

গত পাঁচ বছর বিজেপি গুজরাটে ৪৮-৪৯ শতাংশ ভোট ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে, যা ভারতের মতো বহুদলীয় গণতন্ত্রে একটি বিশেষ মাইলফলক। অন্যদিকে কংগ্রেসের ভোট ৩৮-৩৯ শতাংশ— এ বছর যা ২ শতাংশ বেড়েছে। যার জোরে কংগ্রেস ১৯৯০ সালের পর এই প্রথম ৪০ শতাংশের লক্ষ্মণরেখা পেরোতে সক্ষম হয়েছে। তবে বিজেপি ভোট বাড়াতে সক্ষম হলেও আসন বাড়িয়েছে কংগ্রেস। ২০১২-তে কংগ্রেস পেয়েছিল ৬১টি আসন, এবার পেয়েছে ৭৭টি। ১৬টি আসন বেশি পাওয়ার জন্য বৃদ্ধি ঘটেছে ২৬ শতাংশ। কিন্তু এইসব তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিড়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেকের নজর এড়িয়ে গেছে। বিজেপি ২০১২ সালে জেতা তাদের ৩৩টি আসন কংগ্রেসের কাছে খুইয়েছে। কংগ্রেসও তাদের ১৮টি আসন হারিয়েছে বিজেপির কাছে। বিজেপি তাদের ২০১২-তে জেতা ৭৫ জন বিধায়ককে এবার জিতিয়ে এনেছে। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ২৪। হিসেব করলে দেখা যাবে দুই দলের ২০১২ সালের বিধায়কদের এক-তৃতীয়াংশ এবারের নির্বাচনে হেরে গেছেন, যা স্পষ্টতই অ্যান্টি-ইনকামবেন্সির দিকে ইঙ্গিত করে।

এবারের নির্বাচন দুই দলকেই কয়েকটি বার্তা দিয়েছে। হার্দিক প্যাটেল, জিগনেশ মেভানি এবং অল্পেশ ঠকরেকে সঙ্গে নিয়ে রাহুল গান্ধী জাতপাতের বিপজ্জনক খেলা খেলেছেন গুজরাটে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ সেই খেলায় অংশ নেওয়া তো দূর, সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতে জাতপাতের রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। গুজরাটে ভোট লুট করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা যে-সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সংবিধান বিরোধী। রাহুল গান্ধীর সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিতে বিভ্রান্ত হয়েছেন তপশিলি জাতি ও জনজাতির একাংশ। তার প্রমাণ, জিএসটি ও নোটবাতিল নিয়ে মিডিয়ার এত হৈচৈ সত্ত্বেও শহরাঞ্চলে বিজেপির ভালো ফল এবং তপশিলি জাতি ও জনজাতি-অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত নেতিবাচক ফল। ২০১২ সালে গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনে তপশিলি জাতিদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ১০টি আসন। এবার পেয়েছে ৭টি। অন্যদিকে তপশিলি জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ২৮টি আসনের মধ্যে ২০১২ সালে বিজেপি পেয়েছিল ১৬টি। এবার পেয়েছে ১০টি। অর্থাৎ তপশিলি জাতি ও জনজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে বিজেপি এবার ৯টি আসন হারিয়েছে, যা পেলে বিজেপির মোট আসন সংখ্যা হতো ১০৮ (৯৯ + ৯)।

তবে একটা কথা অনস্বীকার্য রাহুলের এই আত্মঘাতী কৌশল তাৎক্ষণিক ভাবে সফল বলে মনে হলেও অচিরেই তা ব্যুমেরাং হয়ে দেখা দেবে। গুজরাটের প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতারা প্রায় সকলেই হেরেছেন। অবস্থা এমনই রাজ্যের দলীয় নেতৃত্বই না হাতছাড়া হয়ে যায়। শেষে মিডিয়া নিয়ে একটি কথা। মিডিয়া বলছে এবারের গুজরাট নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীকে লড়ে জিততে হয়েছে। তাঁর ক্যারিশমা রাহুল-ম্যাজিকে ঢাকা পড়ে গেছে। একদিক থেকে কথাটা ঠিকই। সিনেমায় আমরা আকছার দেখি। ভিলেনরা দলে ভারী, নায়ক একা। আর কে না জানে ভিলেনরা একজোট হলে নায়ককে লড়েই জিততে হয়। ▮

নির্বাচনে হারের পর হার মিডিয়ায় রাহুল এখনও নেতা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

গুজরাট বিধানসভা ভোটের ফলাফল ১৮ ডিসেম্বর সকাল থেকে টিভি চ্যানেলগুলিতে বিপুল উত্তেজনায় পরিবেশিত হচ্ছিল। পরদিন সংবাদপত্রগুলিতেও স্বাভাবিক কারণে এই সংবাদই ছিল মূল আকর্ষণ।

টিভি চ্যানেলের আচার্য ভাষ্যকারদের কথায় একটু পরে আসছি, কিন্তু পরদিনের বাংলা প্রধান সংবাদপত্রে খুব বড় ছবি (যাতে প্রথমেই নজরে পড়ে) বেরোল কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর। চট করে দেখলেই ভ্রম হবে হয়তো ইনিই নির্বাচন জিতে ক্ষমতা দখল করলেন। সভাপতির পদ তো তিনি ক'দিন আগেই নিজ অধিকারে অর্জন করে নিয়েছেন। প্রাতঃকালের এই কাগজ দর্শনে হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমাদের সাহিত্য সম্রাট তথা দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অব্যর্থ পর্যবেক্ষণ। তাঁর কমলাকান্ত এক জায়গায় বিদ্যা সম্পর্কে বলেছেন, 'বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে বা সংবাদপত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল... কেহ আপত্তি করেন, যে লিখিতে জানে না সে পত্রাদিতে লিখিবে কি করিয়া? আমার বিবেচনায় এ তর্ক অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না।" ঠিক এরকমই রাহুল গান্ধী তিনি জন্ম মুহূর্তেই নেতা শুধু নয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদ-নির্দিষ্ট। তাই হয়তো সহ-সভাপতি পদ থেকে ওইদিন পর্যন্ত ২৯টি বড় নির্বাচন হারার পরও সংবাদপত্রটি তাঁর পদলেহনে কৃতার্থ।

একই সঙ্গে প্রচার চলেছে গুজরাটে বাস্তবিক কংগ্রেসের জয়ই হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হবার তীব্র অভিলাষী আমাদের 'চটি পিসির' (রণজিৎদা) এ সংক্রান্ত বিশ্লেষণও ফেলে দেওয়ার নয়। 'মুখরক্ষা, তবে নৈতিক পরাজয় স্পষ্ট। ২০১৯-এর ঘণ্টা বেজে গিয়েছে।' এই নৈতিকতার গীতা ভাষ্যের পরিসর এখানে নেই। চটি পিসি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেত্রী। কংগ্রেস কিছুটা এগোতে পারলে চটি পিসি ভবিষ্যতে কংগ্রেসি সাহায্যে কোনো খিচুড়ি সরকারের নেত্রী হওয়ার অলীক স্বপ্নে তা দিতে পারেন। সামগ্রিক ফলাফলে ৮ শতাংশ ভোটের বিশাল ফারাক নিয়ে বিরোধী দলকে পরাজিত করে ২৭ বছরের জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার অন্যতম বিরল রেকর্ড (পশ্চিমবঙ্গে বাম বাদে) সৃষ্টি করা জয়কে যদি নৈতিক পরাজয় বলে খাটো করা যায়— তাহলেও সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কথার অমোঘতা মনে আসবে— 'বুদ্ধি কি? —যে আশ্চর্য শক্তি দ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয় জগতে ইহারই আধিক্য' (কমলাকান্ত)। 'জয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করার এটি সেরা' ফলিত উদাহরণ নয় কী?

গুজরাট নির্বাচনে পাপ্পুজী (এখন সভাপতি হওয়ায় নাকি এই সম্বোধন নিষিদ্ধ, আমাদের বন্ধ হতে দেরি হবে) বার বার স্বাধীন ভারতের সর্বাপেক্ষা যুগান্তকারী সংস্কার জিএসটি-কে চলচ্চিত্রের এক কুখ্যাত নৃশংস ডাকাতের নামের সমার্থক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এই কর ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছে। তিনি যে এই কুৎসিত উপমার আমদানি করে নিজের অজান্তেই বঙ্কিম বর্ণিত কুবুদ্ধির নিদর্শন রেখে গব্বর সিং নামধারী হয়ে ওঠেন তার প্রমাণ এই নির্বাচন। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জিডিপি হারের তুলনায় গুজরাটের উন্নয়নের হার ডবল। জাতীয় গড়ের থেকে বেশি। আহমেদাবাদ, সুরাট, রাজকোট, বরোদা দেশের শিল্প উৎপাদনের এক একটি মহীরুহসম শহর। সারা দেশ থেকে এখানে চাকরিপ্রার্থীরা ছুটে যায়। এখানেই জিএসটি-এর প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি পড়ার কথা। কিন্তু ফলে দেখা যাচ্ছে এই চারটি শহরে বিজেপি কংগ্রেসকে চূর্ণ করে ৩২টির মধ্যে ২৮টি আসন দখল করেছে। বহু শিল্পাঞ্চল সমৃদ্ধ দক্ষিণ গুজরাটে ও শহরাঞ্চলে শাসকদল ৫৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বিজেপির ৯৯টি আসন মিলিয়ে জেতার গড় ব্যবধান ২৯৯৬৮, এটি ২০১২ সালের ২৬২৩৬ যা ১১৫টি আসনে ছড়িয়ে ছিল তার তুলনায় যথেষ্ট বেশি। অন্যদিকে কংগ্রেসের গড় জেতার হার মাত্রই ১৩৩৩১টি ভোট। এ সমস্ত পরিসংখ্যানই যে কেউ সংবাদপত্র বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু জয় পরাজয়ের উলট পুরাণকে একটু পরিষ্কার করতেই বাগাড়ম্বর। গব্বর সিং করের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার পরীক্ষাগার বলতে আরবান অর্থে সেই শহরকেন্দ্রিক ৫৮টি আসনের ৪৮টিরই দখল নিয়েছে বিজেপি তার প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক। এই ভৌগোলিক অঞ্চলেই তো তার অভিঘাত ও নির্বাচনী প্রতিফলন সুস্পষ্ট হওয়া উচিত কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। দেশবাসীর সুদূরপ্রসারী হিতের জন্য অর্থনীতিকে মজবুত করতে যার আশু প্রয়োজন ছিল শিল্পপ্রধান গুজরাটের বাসিন্দারা তা অনুমোদন করেছেন। কেননা তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর দায়বদ্ধতা, সততা ও নিরলস পরিশ্রমের ওপর আস্থা রেখেছেন। নিহত হয়েছে এরই পরিপন্থী অশুভ শক্তি গব্বর। কিন্তু গব্বর গহ্বরে গেলেও তিনি ঢাকী, ঢুলী, কাঁসী-সম তিন চেলা চামুণ্ডাকে আমদানি করেছিলেন। তাঁরা তো আদতে নৈরাজ্যবাদী। গব্বরের শাকরেদ শ্যামা, কালিয়া, ঢোলিয়ার মতো এরা দিব্যি বিদ্যমান। এঁদের অনেকেই ভবিষ্যতের ফ্রাকেনস্টাইন হবে। হার্দিক প্যাটেলকে সংবিধান বিরোধী ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও যে বাড়তি সংরক্ষণের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি পৈতেধারী ক্রিস্টান দিয়েছিলেন তারাই তাঁকে অক্টোপাশের মতো ঘিরে ধরবে। ইনি পুরোপুরি কেজরিওয়ালের ক্লোন থেকে তৈরি। ভোটে জেতার পরও বলছেন ইভিএম মেশিনে জালিয়াতি হয়েছে। কংগ্রেস দলের লোকেরাও গণনার দিন ১২টা নাগাদ ধর্নায় বসে পড়েছিল।

আরও দুটি রত্ন বিধানসভায় যাবেন একজন প্রধানমন্ত্রীর দৈনিক ৪ লক্ষ টাকার মাশরুম খাওয়ার মতো নোংরা অভিযোগে পিছপা নন।

ইনি অল্পেশ ঠাকুর। ইনিও এখন কংগ্রেসী। আর একটি জেএনইউ ফেরত কানহাইয়া কুমারের বন্ধু। বিভিন্ন ভারত বিরোধী শক্তির কাছ থেকে অর্থ নিয়ে থাকেন বলে অভিযোগ। যাই হোক, এই সব বিভেদকামী জাতপাত, সন্ত্রাসে মদতকারী শক্তি কংগ্রেসকে ভেতর থেকে ভাঙতে চেষ্টা করবে। গুজরাটবাসী যে দাঙ্গাহীন, কর্মব্যস্ততায় ভরা, পারস্পরিক সৌহার্দের পরিবেশে থাকতে বিগত ২৫ বছর ধরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এরা নিজেদের উচ্চাশা পূরণ করতে যে কোনো অরাজকতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করবে না। আদতে পাপ্পুরও তাই ইচ্ছে। মনে রাখবেন কেজরিওয়াল দিল্লির রাস্তায় রাত্রিবাস করে কি অস্থিরতা তৈরি করে জেলে ঢুকেছিলেন। কিন্তু এই ভাড়া করা লোক এনে পাপ্পু সাময়িক সহজ সাফল্য আনতে গিয়ে কংগ্রেসের সামূহিক ক্ষতি করে ফেললেন। শক্তি সিংহ গোহিল যিনি আহমেদ প্যাটেলকে জেতাতে কর্ণাটকের প্রমোদাগারে বিধায়কদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে গুজরাট বন্যার সময় আমোদে লিপ্ত রেখেছিলেন সেই তিনি সমেত প্রবীণ অর্জুন মোধওয়াদিয়া, অত্যন্ত পরিচিত মুখ সিদ্ধার্থ প্যাটেল সকলকেই জনতা প্রত্যাখ্যান করল। কংগ্রেস এখন গুজরাটে সে অর্থে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ববিহীন। ঢাকি-ঢুলিরা নেতৃত্ব কেড়ে নিতে আরও তৎপর হবে।

প্রথমে বলা টিভি ভাষ্যকারদের ভূমিকা এদিন হঠাৎই আভরণহীন হয়ে যায়। চিরকালীন কংগ্রেস ও বামমনোভাবাপন্ন আচরণে স্বচ্ছন্দ কিছু সময়ের প্রথম দু' ঘণ্টার মাত্র কিছু সময়ের রুদ্ধশ্বাস ওঠানামায় এই মনীষী ভাষ্যকাররা দৃশ্যতই বেসামাল হয়ে পড়েন। নাম করেই বলা দরকার, ইনি ইন্ডিয়া টিভির রাজদীপ সরদেশাই— আমেরিকায় মোদী বিরোধী কথাবার্তা বলায় ব্যাপক প্রহৃত হয়েছিলেন (এনার স্ত্রী সাগরিকা নিত্যদিন টাইমসে মোদীর বাপান্ত করেন)। সাড়ে ন'টা নাগাদ কংগ্রেস ৮৬ বিজেপি ৮৪ হওয়ায় এনার চোখে মুখে চাপা উল্লাস গোপন ছিল না। বলেই ফেললেন, 'সায়দ উলটি গিনতি শুরু হো গিয়া।' অন্য একটি কুখ্যাত চ্যানেলের চূড়ান্ত রায় দেওয়া হয়ে গেল— Reverse to BJP's arrogance। এঁদের দৈববাণীর মাহাত্ম্যে মুহূর্তে দিল্লির কংগ্রেস মহাকার্যালয় বিজয় উৎসবে মেতে উঠল। শুধু তাই নয়, প্রসিদ্ধ ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ লেখিকা শোভা দে বলে উঠলেন 'A gigantic thappad has been delivered in Gujrat'. এখানেই না ছেড়ে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয়ে বললেন, ২০১৯-এর নির্বাচনটা হঠাৎ বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠল'। ফানুস ফাটতে দেরি হয়নি। মুহূর্তেই বিজেপি ১০৭। এরপর সংখ্যাটা কিছুটা নামা ওঠা করলেও অলীক আমোদের সুযোগ আর আসেনি। অন্যদিকে কিন্তু ইভিএম-কে আগাম জালিয়াত খাড়া করার বিষয়টিও জিইয়ে রাখা ছিল। সেই অর্থে গুজরাট নির্বাচনকে উন্মোচনের পর্বও বলা যায়।

যুবরাজের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভরাডুবি

বিধানসভা	নির্বাচন	বিজেপি জয়ী	কংগ্রেস জয়ী
জম্মু ও কাশ্মীর (৮৭)	২০১৪	৫৩ (জোট)	১২
হরিয়ানা (৯০)	২০১৪	৪৭	১৫
মহারাষ্ট্র (২৮৮)	২০১৪	১৮৫ (জোট)	৪২
ঝাড়খণ্ড (৮২)	২০১৪	৩৭	৬
উত্তরপ্রদেশ (৪০৩)	২০১৭	৩১২	৭
উত্তরাখণ্ড (৭০)	২০১৭	৫৭	১১
গুজরাট (১৮২)	২০১৭	৯৯	৭৭

চমৎকার বিদ্রূপে তৎকালীন আবহটিকে ধরেছেন বিজেপি নেত্রী সাজিয়া ইলমি। '৯.১৫-য় ইভিএম খারাপ, ৯.২৫-এ ইভিএম ঠিক হয় হয়, ৯.৩৫ ইভিএম পুরিতরাসে ঠিক হো গয়া (কংগ্রেস এগিয়েছে) রাহুলজী ভয়ঙ্কর পরিশ্রম করেছিলেন। ৯.৪৫-এ গুজরাটে ইভিএম আর এক দফা খারাপ হয়ে গেল।' এর কিছু পরেই এক দল কংগ্রেসি ইভিএম কারচুপির অছিলায় সম্ভাব্য পরাজয়কে নেতার জয় বলে চালাতে আগেভাগেই ধর্নায় বসে পড়েন। দুপুরের পর তাঁরা হয়তো এই কদাচারে আর মন দিতে পারেননি।

ইত্যবসরে, সন্ধ্যের দিক থেকেই পাপ্পুর মস্তিষ্কটিকে আরও চাপে ফেলে ঘোড়েল রাজনীতিক পূর্বতন বিড়ি ব্যবসায়ী প্রফুল্ল প্যাটেল তাঁদের পাওয়া একটি আসন ও ০.৬ শতাংশ ভোট, মায়াবতীর ০.৭ শতাংশ, কংগ্রেস দল থেকে পালানো বাঘেলার ০.৩ শতাংশ ভোটের যোগফলে উচ্চে-রসোগোল্লা, দই-দুধ সব এক হলে আজ পাপ্পু রাজা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উসকে দেন। এ সেই জঙ্গলে সিংহ আর চিত্রকরের গল্প মনে পড়ায়। জঙ্গলে এক চিত্রকর ছবিতে দেখাচ্ছেন একজন মানুষ কড়া দৃষ্টিতে এক সিংহের দিকে তাকিয়ে আছে আর সিংহ ভয়ে জড়সড় হয়ে কুঁকড়ে রয়েছে। চিত্রকর তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'ছবি কেমন দেখছ'? সিংহের উত্তর ছিল— সিংহ চিত্রাঙ্কন করিতে পারিলে চিত্র ভিন্নরূপ হইত।'

অবশ্য, পাপ্পুর এসবে মন ছিল না। শ্রান্ত, অবসন্ন পাপ্পু পুরনো ফর্মে ফিরে ততক্ষণে দলবল নিয়ে দিল্লির এক প্রেক্ষাগৃহে 'Star War-2' নামে এক চলচ্চিত্রের কাল্পনিক জগতে বিচরণরত বলে খবর। মহাগুরত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে তন্ত্রধারকদের এগিয়ে দিয়ে যান। ▮

গুজরাট জয় : দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড়ো সাফল্য

অভিমন্যু গুহ

দেশের রাজনীতিতে এমন স্পষ্ট বিভাজন স্বাধীনতার পর সত্তর বছরে আর কখনও দেখা যায়নি। একপক্ষে রয়েছে দেশপ্রেমিক নাগরিকরা, অন্যদিকে দেশদ্রোহে মদতদাতারা। একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে বিজেপি বিরোধিতা মানেই কি দেশ-বিরোধিতা? এটা যে নয়, তা না বললেও চলে। এনিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে পৌঁছনোর আগে একটা তথ্য খেয়াল করিয়ে দেওয়া যাক। এবার গুজরাট ভোটে হার্দিক প্যাটেল বিজেপি-বিরোধী হলেন, কারণ তার দাবি পাতিদারদের সংরক্ষণের আওতাভুক্ত করতে হবে। ভালো কথা। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন অল্পেশ ঠকরে। তাঁর আবার দাবি অন্যান্য পিছিয়ে পড়া (ওবিসি) শ্রেণীর মধ্যে পাতিদারদের অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। সহজ বুদ্ধি কী বলে? একপক্ষ বিজেপি সরকারের পাশে দাঁড়ালে, অন্যপক্ষ তার বিপক্ষে যাবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল এরা দু'জনে শুধু বিজেপির বিপক্ষেই নয়, একজোট হয়ে কংগ্রেসের পক্ষে ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছে। যেখানে উভয়ের দাবি পরস্পরের বিপরীতমুখী তারা একজোট হয় কী করে? এতে একটা জিনিসই প্রমাণিত হয় ভারতবর্ষকে জাতপাতের ভিত্তিতে টুকরো টুকরো করবার বহু প্রাচীন ষড়যন্ত্রকে আবার ঝেড়েমুছে নামানোর বন্দোবস্ত হচ্ছে এবং সংরক্ষণের ধুয়ো তুলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও নিরীহ মানুষকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। কংগ্রেস চিরকালই দেশের ক্ষতি করে এসেছে। কিন্তু জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী কিংবা রাজীব গান্ধীর সময়েও কংগ্রেস দেশদ্রোহীদের মঞ্চে পরিণত হয়নি যেটা সোনিয়া-রাহুলের আমলে হচ্ছে। নইলে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে দেশের সংসদে হামলাকারী যে আফজল গুরুর ফাঁসি তার পরিবারবর্গকে একপ্রকার কোনো খবর না দিয়েই রাতারাতি কার্যকর করেছিল কংগ্রেস সরকার, সেই আফজল গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী কেন জে এন ইউ-তে পালন করতে দেওয়া হবে না, সে নিয়ে রাহুল গান্ধী কখনও আন্দোলনে নামে? চীনের উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধির সঙ্গে রাহুলের গোপন বৈঠক করা বা সলমন খুরশিদ, কপিল সিব্বলের মতো কংগ্রেস নেতারা যেভাবে একের পর এক দেশের স্বার্থ-বিরোধী ঘটনায় ও দুর্নীতির পক্ষে আদালতে দাঁড়াচ্ছে তাতে কংগ্রেসের দেশদ্রোহী ভূমিকাটা দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। এটা নিছক ক্ষমতায় ফেরার জন্য মরিয়া চেষ্টা বা কেবল বিজেপি- বিরোধিতা ভাবলে বিরাট ভুল হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার বিরোধিতার সুযোগ নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু দেশের গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদে হামলাকারী, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারে এনিয়ে দোষী সাব্যস্ত একজনের মৃত্যুবার্ষিকী পালনের অধিকার কি 'গণতান্ত্রিক অধিকার'-এর পর্যায়ভুক্ত হতে পারে? কিংবা ডোকলাম নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে ভারত সরকারকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে শত্রুতাকারী চীনের উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক কি ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় স্বীকৃত?

এই প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজে পেলে বোঝা যাবে যে গুজরাটে বিজেপির সাফল্য শুধু তার দলগত জয় নয়, এই জয় দেশের মানুষের, দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই সাফল্য। আফজল কাণ্ডে রাহুল হাত মিলিয়েছিল বামপন্থী ও

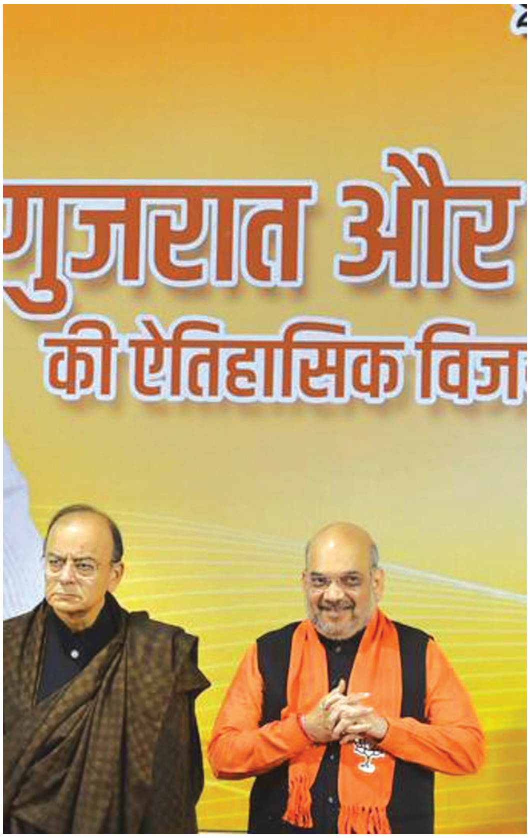

নকশালদের সঙ্গে। সংসদকে যারা একসময় শুয়োরের খোঁয়াড় বলে অভিহিত করেছিল এবং কার্গিল যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের সমর্থনে একটা কথাও না বলা কিংবা জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডে জওয়ান হত্যা সমর্থন করার মতো দেশবিরোধিতা তাদের রক্তে। রাহুলকে দেখে কেবল এই দেশদ্রোহীরাই উৎসাহিত হয়নি, বিভিন্ন দুর্নীতিপরায়ণ আঞ্চলিক দলগুলি লালু, মুলায়ম থেকে মমতা, মায়াবতী পর্যন্ত ঘোঁট পাকানোর একটা উপযুক্ত মঞ্চ পেয়েছে। রাহুল-নকশাল সংযোগ এই মঞ্চকে দেশদ্রোহিতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। বিজেপি-বিরোধিতার নামে দেশ-বিরোধিতাই যার একমাত্র লক্ষ্য। গুজরাটের মানুষ পরাজিত করেছে এই চীন-পাকিস্তানের মানসপুত্র-কন্যাদেরই। এই দেশবিরোধী মঞ্চের সামনে সবচেয়ে বিপজ্জনক শক্তির নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সঙ্ঘের সামাজিক সমরসতা বা একতা অর্থাৎ সব ভারতবাসীই এক, তাঁদের মধ্যে জাতপাতের কোনো ভেদ নেই— এই কর্মসূচি দেশজুড়ে নতুন করে সাফল্যের মুখ দেখেছে। প্রতিটি দেশবাসী আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, জাতপাতের সংকীর্ণ বিভেদ ভুলে নিজেদের পরিচয় একমাত্র 'ভারতবাসী' হিসেবেই দিচ্ছেন, এটা দেশদ্রোহীদের পক্ষে হজম করাটা অসম্ভব।

তাই দিকে দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ, মুসলমান-দলিত নিগ্রহ ইত্যাদি জুজু তোলা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলি ঘটেছে, তার পেছনে এই নকশাল-মুসলমান জোটের হাত থাকলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যাতে বিজেপির বিরুদ্ধে জনগণকে খেপিয়ে তোলা যায়। কিন্তু তাদের এই অপপ্রচেষ্টা ও চক্রান্ত উত্তরপ্রদেশবাসী ২০১৭-র গোড়াতে ভেস্তে দিয়েছিলেন। এবছরের শেষে তা দিলেন গুজরাটবাসী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের যে কিছু পরাজয় ঘটেছে তার মূলেও এই নকশাল-দলিত-মুসলমান জোট। কিন্তু এই জোটের দেশবিরোধী চেহারাটা অধিকাংশ দেশবাসীর কাছেই স্পষ্ট হচ্ছে, গুজরাটের আর হিমাচল প্রদেশে বিজেপির সাফল্য সেই ইঙ্গিতই দিল।

গুজরাটের নির্বাচনে পাতিদার আর অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে কী ধরনের প্রতারণা হার্দিক ও অল্পেশ করেছিল, তার নমুনা তো প্রবন্ধের শুরুতে দিয়েছি। দেশদ্রোহীদের ফর্মূলা মেনে এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দলিত নেতা জিগনেশ মেভানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও গুজরাটে বিজেপির ভোট গত বিধানসভা নির্বাচনের সাপেক্ষে তো কমেইনি বরং বেড়েছে। বিজেপি ২০১৭-য় পেয়েছিল ৪৭.৮৫ শতাংশ ভোট। কিছু আসন কমার কারণ ওই দেশদ্রোহীদের একজোট হওয়া। গুজরাটের নির্বাচন এই ইঙ্গিতও দিল যে ভারতীয় গণতন্ত্রে অনাস্থা- প্রদর্শনকারী দেশদ্রোহীরা আর ভেক ধরে নয়, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেই আসরে নামবে। সামনাসামনি লড়াইয়ের সুযোগ পাবেন দেশবাসী।

গুজরাট নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে যে ধরনের অপপ্রচার, কুৎসা রটানো হয়েছে, কোনো গণতান্ত্রিক কাঠামোয় তা সম্ভব বলে ভাবাও যায় না। অন্য কোথাও হলে কী হতো বলা যায় না, তবে গুজরাট বলেই বোধহয় কোনো অঘটন ঘটেনি। ২০০২ সালে ট্রেনের কামরায় করসেবকদের পুড়িয়ে মারার দগদগে ঘা এখনও গুজরাটবাসীর মনে। গুজরাট জুড়ে যখন তার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তখন নরেন্দ্র মোদীকে সোনিয়া গান্ধীর 'মওত কা সওদাগর' বলা গুজরাটবাসীর মনে কংগ্রেস সম্পর্কে ঘৃণাবোধের জন্ম দেয়। এমনিতে ২২ বছর ধরে একটি রাজ্যে কোনো সরকার ক্ষমতায় থাকলে, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভোট বা অ্যান্টি-ইনকামবেন্সির সমস্যা আসতে বাধ্য।

কিন্তু গুজরাটে এই প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা কার্যকর হয়নি মূলত দু'টি কারণে। প্রথমত, বিজেপি সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মসূচি, যা ভাইব্রান্ট গুজরাটের জন্ম দিয়েছে, দ্বিতীয়ত কংগ্রেসের প্রতি সেখানকার মানুষের প্রবল ঘৃণাবোধ। গোটা চৌত্রিশেক মন্দিরে ঘুরে রাহুল গান্ধী তার মায়ের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করলেও গুজরাটবাসী মূর্খ নন। তাঁরা দেশদ্রোহীদের চিনতে ভুল করেননি। তাই যখন জিএসটি ইত্যাদি নিয়ে অপপ্রচার চলছিল তখন গুজরাটের শহরাঞ্চলের ব্যবসায়ীরা সাময়িকভাবে বিরূপ হলেও পরে বলেছিলেন, 'আমরা রাগতে পারি, কিন্তু তা বলে বিশ্বাসঘাতক নই।' গুজরাটবাসী বিশেষ করে শহরাঞ্চলের মানুষের বিশ্বাসই বিজেপিকে তার মসনদ অটুট রাখতে সাহায্য করেছে। দেশদ্রোহীদের চক্রান্ত কিছুটা হলেও সফল হয়েছে গ্রামাঞ্চলের দিকে। যেমন বিদ্যার্থী পরিষদের বিরুদ্ধে সফল হয়েছিল কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিষয়টি নিয়ে দেশভক্তদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ ধর্মকে কেন্দ্র করে দেশ-বিভাজন আজ থেকে ৭০ বছর আগেই হয়ে গিয়েছে। এবার জাতপাতকে কেন্দ্র করে দেশকে টুকরো টুকরো করতে পারলেই দেশদ্রোহীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। বিজেপি মুসলমান-বিরোধী— এই স্লোগান প্রথমে উত্তরপ্রদেশ, পরে গুজরাটেও মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেই গুজরাট যা বিজেপি বিরোধিতার মুসলমান জুজুর সেরা হাতিয়ার ছিল। এখানেও এবার মুসলমান প্রধান এলাকাতে বিজেপি ভালো ফল করেছে। সুতরাং জাতপাতই সম্বল। যাতে দেশের নিরীহ লোকগুলিকে খেপিয়ে তোলা যায়। গুজরাট দেশদ্রোহীদের শিক্ষা দিল এতে ফল ভালো হবে না। ২০১৯-এ যে এদের কুলোর বাতাস দিয়ে ভারতবাসী তাড়াবে সেই আগাম ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলো গুজরাট। ▮

এই সময়

ট্রেনে বিপত্তি

দিল্লি মেট্রোর একটি চালকবিহীন ট্রেন হঠাৎ ব্রেক ফেল করে দেওয়ালে ধাক্কা মারে। ট্রেনটি

চালিয়ে টেস্ট করার সময় এই ঘটনা ঘটেছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যিনি ছিলেন তাঁর গাফিলতিতেই এই কাণ্ড। তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দেরাদুনে চিতা

দেরাদুনের কেওয়াল বিহার ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা। কিছুদিন আগে সেখানে দিনদুপুরে

একটা চিতাবাঘ ঢুকে পড়ে। চিতাটি লাফ দিয়ে একটি বাড়িতে ঢোকে। কিছুক্ষণ পর সেই বাড়ির মালিককে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখা যায়। এই ঘটনায় আশেপাশের অঞ্চলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

দু'হাতে

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় হেনস্থা করা হয়। সবসময় যে তার পিছনে কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকে

তা নয়। এবারে যেমন ট্রাম্প দু'হাতে গ্লাস ধরে জল খান বলে হেনস্থা করা হয়েছে। এভাবে জল খেলে নাকি বাচ্চাদের মতো লাগে!

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিকোৎসব

'ইংরেজরা ভারতবর্ষে বনবাসী সমাজের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও একই ধারা বয়ে গিয়েছে। সংবিধানপ্রণেতা আম্বেদকরের স্বপ্ন ছিল এক সমরস সমাজ নির্মাণের। অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম আম্বেদকরের সেই

ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বনবাসী সমাজের আর্থিক ও সামাজিক সমতা তৈরির কাজ করে চলেছে। সুদূরবর্তী পাহাড়-জঙ্গলে বসবাসকারী বনবাসী ভাই-বোনদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কাজ করে চলেছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম।' গত ১৭ ডিসেম্বর কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা ও হাওড়া মহানগর শাখা আয়োজিত বার্ষিক উৎসবে কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ সম্পর্ক প্রমুখ অরুণ কুমার। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন কলকাতা মহানগর সভাপতি জীতেন্দ্র চৌধুরী এবং হাওড়া মহানগর সভাপতি শঙ্করলাল হাকিম। অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের বনবাসী কার্যকর্ত্রী শ্রীমতী ঠমা পাওয়ারকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। শেষে শ্রীমতী ঠমা'র প্রেরণাদায়ী জীবন অবলম্বনে নাটিকা মঞ্চস্থ হয়।

সহকার ভারতীর পূর্বমেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

সহযোগিতা, সমন্বয় ও সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে সমবায়কে সমাজের প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা মজবুত করার লক্ষ্যে সহকার ভারতী পূর্ব

এই সময়

খেলতে গিয়ে ফাঁকা

আয়ারল্যান্ডের কর্ক শহরের এক চোদ্দ বছরের কিশোর জনপ্রিয় ভিডিও গেম খেলতে গিয়ে

মায়ের অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দিয়েছে। মা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে পারেন। উল্লেখ্য, গেমটি খেলার সময় পর্যায়ক্রমে টাকা ভরতে হয়।

ভেড়ায় আপত্তি

জুতো পছন্দ হয়নি তাই মেলবোর্ন এয়ারপোর্টের কোয়ান্টাস ক্লাব বিজনেস ক্লাব

লাউঞ্জে ঢুকতে দেওয়া হলো না জোয়ান ক্যাথেরলকে। তিনি ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো পরেছিলেন। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ওই জুতো আসলে স্লিপার্স, যা শুধু শোবার ঘরেই পরা যায়।

রেকর্ডে পোশাক

বিশ্বের সব থেকে লম্বা বিয়ের ড্রেস বানিয়ে ফ্রান্সের ডায়নামিক প্রোজেক্ট নামের একটি

সংস্থা গিনিস বুকে নাম তুলেছে। পোশাকটি লম্বায় ৮,০৯৫ মিটার। ১৫ জন কারিগর দু'মাসে পোশাকটি বানিয়েছেন।

সমাবেশ -সমাচার

মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১০ ডিসেম্বর নন্দকুমারে প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে সমবায় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সদস্য, কার্যকর্তা ও স্বসহায়ক দলের সদস্য এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় পাঁচশতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে সম্মেলনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা মায়েদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সহকার ভারতীর সর্বভারতীয় সহসংগঠন সম্পাদক বিষ্ণু বোবড়ে, সর্বভারতীয় তন্তুবায় সমিতি সেলের সহ প্রমুখ সন্তোষ শীল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর সহ বিভাগ কার্যবাহ গৌরহরি সামন্ত, কন্যা গুরুকুল আশ্রমের মহারাজ হৃদয়ানন্দ আর্য, সহকার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক বিবেকানন্দ পাত্র। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অশোক কুমার রায়, কৃষ্ণ প্রসাদ মাহাত, শোভনা রায়, দিলীপ কুমার খুটিয়া, রতন প্রামাণিক, প্রসূন কুমার মিশ্র প্রমুখ। সম্মেলনে বক্তারা সহকার ভারতীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কে সমাজের মানুষকে অবহিত করার কথা বলেন। সহকার ভারতী ভারতের সমবায় জগতের একমাত্র বেসরকারি সংগঠন যারা প্রতিনিয়ত সমবায়ী ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির সঙ্গে এক সঙ্গে মিলে কাজ করে চলেছে।

গোপীবল্লভপুরে শিশু সংস্কার কেন্দ্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের সেবা বিভাগের শিশু সংস্কার কেন্দ্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ঝাড়গ্রাম জেলার পুটুলিয়া গ্রামে। ৫টি সংস্কার

কেন্দ্রের ২১০ জন ভাই-বোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ১৩ জন অংশগ্রহণ করে। ডাঃ অরুণ কুমার গিরি, রাজকুমার ঝা, অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারি এবং সঙ্ঘের সহ-সেবাপ্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন।

সংস্কৃতভারতীর হুগলী জেলা সম্মেলন

গত ১৭ ডিসেম্বর হুগলী মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ জন্মোৎসব উদযাপন উপলক্ষে সংস্কৃতভারতীর জেলা সংস্কৃত সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক অরিন্দম বিশ্বাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, অনুবাদ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাই সব ধর্মের মূল গ্রন্থই পড়ে শেখা ভাল। মূল সংস্কৃত পড়েই আমাদের ধর্ম সংস্কৃতি শেখা উচিত। কারণ অনুবাদে

এই সময়

জলসিংহ

সানফ্রানসিস্কোর সমুদ্র উপকূলে স্নান করার সময় স্নানার্থীরা সম্প্রতি ভয়ানক বিপদে

পড়েছেন। জলে নামলেই জলসিংহরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আক্রমণ করছে। রিক মালভহিল নামে এক ব্যক্তি জলসিংহের কামড় খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি। স্নানে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

দেশান্তরি

মিস ইরাক সারা ইডান মিস ইজরায়েলের সঙ্গে সেলফি তুলেছিলেন। সেই অপরাধে (!)

ইডানের পরিবারকে ক্রমাগত হত্যার হুমকি দিচ্ছিল একদল মৌলবাদী। শেষ পর্যন্ত পরিবারের সবাই দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন। খবরটি পোস্ট করেছেন ইডান স্বয়ং।

কর্ণাটকে বিজেপি

কর্ণাটকের জন্য বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত পি

মুরলীধর জানিয়েছেন রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ভালো ফল করবে। তিনি বলেন, শাসকদল কংগ্রেসের দুর্নীতিতে ক্ষুব্ধ মানুষ এবার সিদ্দারামাইয়া সরকারকে উচিত শিক্ষা দেবেন।

শতকরা ৩০/৪০ ভাগ পাওয়া যায়। সম্মেলনে অশীতিপর অধ্যাপক সুনীলেন্দু ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বলেন, সংস্কৃতভারতী যেভাবে সংস্কৃতের প্রসার ও প্রচারের চেষ্টা করছে তা সাধুবাদযোগ্য এবং সকলের তাতে সাহায্য করা উচিত। কারণ সরকার এই কাজ সেভাবে করছে না। প্রধান অতিথি ড. রাকেশ দাশ তাঁর সরল সংস্কৃত ভাষণে সংস্কৃত চর্চার প্রয়োজনীয়তা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। পরিপূর্ণ সভাগৃহে অমৃতবচন, সুভাষিতম্, সমবেত সংস্কৃতগীত সকলে মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করেন। সম্মেলন সঞ্চালন করেন সুনন্দা।

পরিবার প্রবোধন সম্মেলন

গত ১৭ ডিসেম্বর উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলায় রঘুনাথগঞ্জ শহরে সরস্বতী শিশুমন্দিরে পরিবার প্রবোধনের এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নগরের বিভিন্ন পরিবার থেকে ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের

মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে একান্নবর্তী পরিবারের গুরুত্ব, হিন্দুদের ১৬ সংস্কার, হিন্দুজীবন পদ্ধতির অবক্ষয়ে পাশ্চাত্য প্রভাব ইত্যাদি বিস্তারিত বর্ণনা করেন এবং সমাজকে রক্ষা করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। সম্মেলন পরিচালনা করেন পরিবার প্রবোধনের জেলা সংযোজক শুভাশিষ সাহা। শান্তিমন্ত্রের মাধ্যমে কার্যক্রমের সমাপ্তি হয়।

ষষ্ঠবার নির্বাচনে জিতে দক্ষতার পর্যাপ্ত প্রমাণ রেখেছে বিজেপি

অতিথি কলম

জয় পণ্ডা

যে দুটি রাজ্যের ফলাফল সদ্য প্রকাশ পেল তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই খবরাখবর ও তা নিয়ে পণ্ডিতি বিশ্লেষণের নিরিখে নিঃসন্দেহে গুজরাটই প্রাধান্য পেয়েছিল। আবার গুজরাট প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্য হওয়ায় উভয়পক্ষের কাছেই ছিল তীব্র মর্যাদার লড়াই।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কোনও মতেই যেমন রাজ্যটি খোয়ানো বরদাস্তের ছিল না, অন্যদিকে তেমন বিপক্ষের কাছে এটি দখল করা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। নিশ্চিতভাবেই আমাদের মতো বড় দেশে যে কোনও একটি রাজ্যে একাদিক্রমে ২২ বছর ক্ষমতায় থাকা তো মুখের কথা নয়। তাই এর ফলশ্রুতিতে অ্যান্টি ইনকামবেন্সির বিষয়টি বিরোধীপক্ষের কাছে বড় সুযোগ এনে দেয়। বিশেষ করে রাজ্যটিকে অধিকার করতে পারলে তারা এটাও প্রচার করতে পারবে যে ভোটদাতাদের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর যে বিপুল জনপ্রিয়তা ও ভোট জেতার সুনাম রয়েছে তাতেও বড় ধাক্কা দেওয়া যাবে। শুধু এটুকুই নয়, আদতে সব থেকে কঠিন ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিস্থিতির মধ্যেও ম্যাচ বের করে নেওয়ায় তাঁর যে অবিসংবাদিত দক্ষতা সেটাও পরীক্ষার মুখে পড়েছিল। কী ছিল না এখানে! তুমুল বক্তৃতার ঝড় যার মধ্যে জাতপাত, জাতীয়তাবাদ থেকে প্রতিদিন বিষয়ের মান দ্রুতগতিতে নিম্নগামী হওয়ার মাধ্যমে শুরুর সেই বিকাশমুখী অ্যাজেন্ডা প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। সত্যিই ভারতীয় গণতন্ত্রের এটি একটি তিক্ততম নির্বাচনী সংগ্রাম হিসেবেই থেকে যাবে। কিন্তু ফলাফল বেরোবার পর এই নির্বাচন সংক্রান্ত এমন কতকগুলি মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক পরিসংখ্যান উঠে এসেছে যেগুলি আগামী নির্বাচনগুলির ওপর আনুপাতিক বা আরোপিত হিসেবে ধরে বিশ্লেষণ করলে ভবিষ্যৎ ফলাফলের একটা নির্ভরযোগ্য রূপরেখা পাওয়া যেতে পারে।

কংগ্রেস দল ও তার সমর্থকরা আসন সংখ্যার হিসেবে গতবারের চেয়ে কিছু আসন বেশি পাওয়ার কারণে দেশব্যাপী উৎসবের আবহ তৈরি করেছে। অন্যদিকে সঙ্গত কারণেই বিজেপি ২০১২ সালের থেকে এবার ভোট শতাংশ ১-এর কিছু বেশি এগিয়ে ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে। কিছু আসন কম পেলেও এত বছর ক্ষমতায় থাকার পরও এই বৃদ্ধি খাটো করে দেখার নয় এটিই তাদের অভিমত। ভারতীয় নির্বাচনী ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সুবাদে অনেকদল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় কখনই ৫০ শতাংশ ভোট পাওয়ার বাধ্যবাধকতা মানতে হয় না। ভোটের আগে কোনও পাকাপোক্ত নির্বাচনী জোট না থাকলে সাধারণত যে দল ৩০ শতাংশ বা তার কিছু বেশি ভোট পায় তারাই শেষমেশ জয়ী হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে বিজেপির ২০১৪-র যুগান্তকারী লোকসভা জয়ের সময় তাদের সারা দেশে প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩১ শতাংশ।

পরবর্তী বিভিন্ন নির্বাচনের সময়ে সমস্ত বিরোধী দল কেবলমাত্র বিহারেই একজোট হতে পেরে নির্বাচনে জিতেছিল। কিন্তু গুজরাটের বেলায় শাসকবিরোধীরা একত্রিত হয়েও জেতার মতো রসদ সংগ্রহ করতে পারেনি। কিছু বিশ্লেষক এমনটা বলছেন যে এন সি পি এবং বিএসপি যাদের মিলিত ভোট শতাংশ ১ এর কিছু বেশি, তারা যদি আলাদা না থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়ত তাহলে ফলাফল অন্যরকম হতো। কিন্তু এই পূর্বনির্বাচনী জোটের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ঘর্ষণের বীজ। এটিকে সফল করতে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় দীর্ঘ সঞ্চিত অহমিকার বিসর্জন, অনেক সময় যুগ-লালিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাধি। তবে, গরিষ্ঠাংশ বিরোধী দলকে বেশ কিছু আসনে জোটসঙ্গী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামানো গেলেও সমস্ত কেন্দ্রে দেশব্যাপী সকলকে একত্রিত করা শক্ত শুধু নয় ভীষণ ভীষণ শক্ত। দেওয়ালের লিখন অকাট্য হলেও এবং এই সুবাদে বেশ কিছু নেতার এককাট্টা হয়ে লড়ার আহ্বান সত্ত্বেও

“গরিষ্ঠাংশ বিরোধী দলকে বেশ কিছু আসনে জোটসঙ্গী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামানো গেলেও সমস্ত কেন্দ্রে দেশব্যাপী সকলকে একত্রিত করা শক্ত শুধু নয় ভীষণ ভীষণ শক্ত। দেওয়ালের লিখন অকাট্য হলেও এবং এই সুবাদে বেশ কিছু নেতার এককাট্টা হয়ে লড়ার আহ্বান সত্ত্বেও এদের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দিয়ে ২০১৯-এর নির্বাচনে যাওয়া বাস্তবে বেশ কষ্টসাধ্য।”

এদের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দিয়ে ২০১৯-এর নির্বাচনে যাওয়া বাস্তবে বেশ কষ্টসাধ্য।

গুজরাটের ক্ষেত্রে ২২ বছর রাজ্য শাসন করার দোষগুণের বোঝা কাঁধে নিয়ে ষষ্ঠবার নির্বাচন জিতে আসা তাদের ক্ষমতার পর্যাপ্ত প্রমাণ রেখেছে। অবশ্যই তাঁদের অস্ত্র সম্ভারে ছিল মোদীর মতো আয়ুধ ও অমিত শাহের মতো জমিন স্তরে শেষতম বুথটি পর্যন্ত নখদর্পণে রেখে নির্বাচন লড়ার প্রবাদপ্রতিম প্রায় যান্ত্রিক দক্ষতা। ষষ্ঠবারের এরকম জয়ের আশপাশে আছে এগিয়ে বাংলায় বামফ্রন্ট ৭ বার, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ৪ বার, ওড়িশায় বিজু জনতা দলও ৪ বার। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিমাচলপ্রদেশে মাত্র একটি টার্ম ক্ষমতায় থেকেই নির্মম পরাজয় বরণ করল কংগ্রেস। তাই তুলনায় এই জয়কে আরও তারিফ করা যেতেই পারে। এর ফলে স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠে আসে, তাহলে কংগ্রেস তার নতুন নেতাকে পেয়ে সত্যিই কি বাড়তি শক্তিমান হয়ে উঠল নাকি গুজরাটে নিছক দীর্ঘ ২২ বছরের স্বাভাবিক দীর্ঘ দিনের শাসক-বিরোধী পুঞ্জীভূত বিরোধিতার নিছক প্রতিফলনেই কিছু বাড়তি আসন পেল? শুধু তাই নয়, কংগ্রেসকে ভাবতে হবে তারা কি ৯০-এর দশকের সেই তাঁমাদি হয়ে যাওয়া জাতিগত সমীকরণের রাজনীতি ফিরিয়ে আনবে? যা তারা গুজরাটে প্রয়োগ করে একটি ২২ বছর শাসন চালানো নানারকমের টালমাটাল করে দেওয়া অর্থনৈতিক সংস্কারের ধাক্কায় তথাকথিত ভাবে জর্জরিত বিরোধী-অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে থাকা সরকারকে টলাতে পারল না। তারা অন্য জায়গায় ভিন্নতর পরিস্থিতির মোকাবিলায় কী সাফল্য পাবে। কিছুটা তড়িঘড়ি ও জটিল পরিস্থিতির মধ্যে জিএসটি চালু করে দেওয়ার ফল যে দেশের রাজ্যে রাজ্যে বিরূপ ও কেন্দ্রবিরোধী প্রভাব ফেলেছে— এই তথ্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছে গুজরাট নির্বাচন। এর আগে উত্তর প্রদেশের নির্বাচন একইভাবে বিমুদ্রীকরণ-বিরোধী প্রচারের তাণ্ডবকে সফলভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

আগামী দিনে এই ফলাফলগুলি দিগ্‌দর্শনকারী হতে পারে। এই সংস্কারগুলির স্বল্পমেয়াদি প্রতিক্রিয়ার মেয়াদ প্রায় শেষ হতে চলেছে, কেননা ইতিমধ্যেই জিডিপি বৃদ্ধির পথে ফিরে এসেছে। তদুপরি, জিএসটি ক্ষেত্রে সরকারের তরফে নানান প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে যেভাবে প্রয়োজন নির্ভর করা হয়েছে তাতে অসন্তুষ্টির মাত্রায় ভাটা পড়তে শুরু করেছে। ফলে ভবিষ্যতে কতদিন আর এর রাজনৈতিক ব্যবহারের ধার থাকবে তা সন্দেহের বিষয়। উল্টে এটিকে এক জাতীয় সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের দিনই হয়তো সমাগত।

চূড়ান্ত ফলাফল নিয়ে চুলচেরা বিচার চলাকালীন প্রথমে দেশের শেয়ার বাজারে হঠাৎ ধস নামে। কিন্তু ফলাফল সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা শুধু হারানো জমি পুনরুদ্ধারই করেনি অনেক উচ্চ সীমায় উঠে যায়। গোদা বাংলায় বাজার যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ব্যবসায়ী সমাজ প্রাথমিকভাবে জি এস টি ও বিমুদ্রীকরণের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা সন্ত্রস্ত থাকলেও খুব তাড়াতাড়ি বুঝে যায় সন্দেহ অমূলক। তারা নিজেদের পুঁজি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনে অর্থাৎ বাজারে বিনিয়োগ বাড়তে থাকে।

আরও যে গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাটি উঠে এসেছে তা হলো শহর-গ্রামের তারতম্য। দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত নগরায়ণের প্রক্রিয়া জারি থাকায় এবং নীতিগতভাবে স্মার্ট সিটি ইত্যাদি তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ায় শহুরে ভোটের বিজেপির পক্ষে বিপুল বৃদ্ধি দলের পক্ষে সুখবর। একইভাবে গ্রামাঞ্চলে সাফল্যের স্বাদ পাওয়ায় কংগ্রেস চাষিদের অসুবিধে ও তাদের অসন্তোষের কথা দেশের আরও বিভিন্ন প্রান্তে বাড়তি মনযোগ দিয়ে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মোদী সরকারের কর্তব্য নির্ধারিত হয়েই আছে। তাদের গ্রামীণ ক্ষেত্রে আরও নজর দিতে হবে যেখানে অসন্তোষ অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা যথেষ্ট আভাস দেখা গেলেও তা স্বল্পমেয়াদি স্তরে পর্যাপ্ত চাকরি কিন্তু তৈরি করতে পারবে না। এই সমস্যার চটজলদি সমাধান এখনও নেই।

সামনে মুখোমুখি হওয়ায় জন্য বেশ কিছু রাজ্য নির্বাচন অপেক্ষমান থাকার নিরিখে এক্ষুনি নির্দিষ্ট খরচের সীমারেখার মধ্যে থেকে সমগ্র দেশবাসীর জন্য (যারা নির্দিষ্টভাবে যোগ্য) একটি সার্বজনিক আধার নির্ভর সাধারণ আয়ের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরি। ■

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
❖ Portfolio Management Services	❖ Retirement Planning
❖ Mutual Fund	❖ Pension Fund
❖ Life Insurance	❖ Children Education Fund
❖ General Insurance	❖ Daughter Marriage Fund
❖ Mediclaim	❖ Estate Creation
❖ Accidental Insurance	❖ Wealth Creation
❖ Company Bond & Fixed Deposit	❖ Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

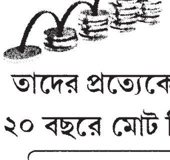

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

মিউচুয়াল ফাণ্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

চিঠিপত্র

হিন্দু বাঙালির উপাধি

হিন্দু বাঙালির উপাধি বিষয়ে রবীন সেনগুপ্তের অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সাধুবাদ জানাই। তাঁর লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হলাম। এ বিষয়ে অনেকদিন থেকেই আমার অনেক কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা রয়েছে।

অখণ্ড বাংলাদেশের বিরাট ভূমিখণ্ডে যে বাঙালি জাতির বসবাস, সেখানে মাটির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় কোনো বিশেষ একটি বর্ণ বা উপাধিধারী জনবসতি বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। আমরা একটু চোখ মেলে তাকালেই বুঝতে পারব কোনো একটি জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনীতি, এমনকী সংস্কৃতির সুরেও সামান্য পার্থক্য সৃষ্টি হলে তা প্রকট হয়ে ওঠে।

আমি বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ করেছি। বর্তমানে হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর খণ্ডের পেঁড়ো গ্রামে কর্মসূত্রে বসবাস করছি। এই দুই জেলা এবং বর্ধমান, নদীয়া বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলাগুলির জনবিন্যাস সম্পর্কে আমার সামান্য ধারণা রয়েছে। প্রতিটি জেলায় বাঙালির জনবিন্যাসের ভিন্নতা চোখে পড়ার মতো।

প্রথমে হাওড়া জেলার কথায় আসছি। আমার বিদ্যালয়টি কানপুর গ্রামে। গ্রামটিতে অনেক বিত্তবান লোকের বাস। এরা মূলত তেলি, তিলি প্রভৃতি বণিক গোষ্ঠীর মানুষ। এদের উপাধিগুলি হলো— সাউ, দে, চন্দ্র, মাহিন্দার, কুণ্ডু, নন্দী, শেঠ, চিলা, সাধুখাঁ প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে— ভট্টাচার্য, মুখার্জী, চ্যাটার্জী এবং পালধি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। এঁরা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। মা ভদ্রকালীর পালার বা সেবাকার্যের অধিকারী, এই অর্থে পালধি। মহালয়ার স্তোত্র/সংলাপ রচনাকারী বাণীকুমারের মামার বাড়ি এই পালধিপরিবারে। এছাড়া আছেন— ঘোষাল ব্রাহ্মণ। মাহিষ্যদের মধ্যে রয়েছে— মান্না, পাত্র, কোলে, জানা, পোড়েল, ভুঁইয়া/ভুঁইঞা, মাইতি, পল্ল্যে, বেরা, মাঝি, সানা, পান, পাঠক, ধাড়া, গড়, বাগুই, আডু, গুছাইত, সামুই, সামন্ত, হাইত, ভৌমিক, বাড়ুই, পাঁজা, পোড়ে, মাজি, কর, হাটুই, সি, দালাল (তাঁতি), বারিক, সুর।

তপশিলি জাতিভুক্ত ক্যাওড়া সম্প্রদায় রয়েছে। তাদের উপাধি— ঘাঁটা, সিং, রায়, মালিক প্রভৃতি। আশপাশে দুলে, বাগদি প্রভৃতি তপশিলি জাতিভুক্ত জনগোষ্ঠী রয়েছে। উপাধি— রায়, সিং, দাস, ঢ্যাং, নাড়ু, খোটেল, শাল, খাঁ, দলুই, বাগ, বারিক, সাঁতরা, রুইদাস (মুচি), মাটি, মেটে, পাখিরা (জেলে), বড়াল, মাল, দত্ত, সেন (ময়রা), মোদক, মল্লিক (তিলি), চরিত (ময়রা), ধাওয়া, সুর সোম, আশ, কয়াল, শাসমল, নাম, দেবনাথ, সিন্‌হা (নমঃশূদ্র), নায়েক, পাছাল, হাটুই, খামরুই, গায়েন, কনুই, কড়ুই, খুকু, রং, করাতি, সাহু, বাকুলি, বাঁদুরি।

কতকগুলি সাধারণ উপাধি, যেগুলি বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির মধ্যে দেখা যায়। যেমন— (১) হাজরা— এটি আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, দায়-মা, হয়। হাওড়ায় দেখছি--- মাহিষ্যদের উপাধি। (২) পণ্ডিত— এটি পাওয়া উপাধি। বাড়িতে মা মনসাদেবী আছেন বলে মাহিষ্যরাও পণ্ডিত। এটি বীরভূম জেলায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপাধি বলে জানি। (৩) সরকার--- তেলিদের উপাধি, তপশিলিদেরও। বীরভূম জেলায় এটি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের উপাধি হয় বলে জানি। (৪) দত্ত— এটি মূলত কায়স্থদের হয় বলে জানি। এছাড়া বারুজীবীদেরও কারও কারও পদবি দত্ত দেখছি। (৫) দাস— মূলত বৈষ্ণবদের পদবি। এছাড়া মুচি, কায়স্থ, বারুজীবী নমঃশুদ্র ইত্যাদির মধ্যে পাচ্ছি। দাশ— বানানের প্রকারভেদে দাশ কথাটি বৈদ্য-ব্রাহ্মণদেরই হয়। দাশ— মানে শ্রেষ্ঠ/ব্রাহ্মণ। উদাহরণ— জীবনানন্দ দাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ৬। রায়— এই উপাধি সকল বর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়। (৭) চৌধুরী--- এটিও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য-ব্রাহ্মণ, কলু প্রভৃতি বর্ণের মানুষের মধ্যে দেখা যায়।

বীরভূম জেলার কথায় আসি। এখানে অধিক পরিমাণে সদ্‌গোপ চাষিদের বাস। এরা মণ্ডল, পাল, রায় প্রভৃতি উপাধিধারী। এছাড়া কলু সম্প্রদায়ের মানুষ বীরভূম ও সংলগ্ন দুমকা জেলায় অনেকে আছেন। এদের উপাধি গড়াই, চৌধুরী প্রভৃতি। শুঁড়ি সাহা আছেন অনেক। তপশিলিদের মধ্যে হাড়ি গোষ্ঠীর পদবি— মাহারা। এছাড়া আছে বাগ্‌দি, মাল, কোনাই। বর্ধমান জেলায় প্রচুর উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুড়ে জনগোষ্ঠীর লোক বাস করেন। তাদের উপাধি— সর, কোঙার, চম্পটি প্রভৃতি। এগুলি বর্ধমান জেলার নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। নদীয়া জেলায় প্রচুর নমঃশূদ্র রয়েছেন। তাদের উপাধি বিশ্বাস। নিম্নবর্ণের মানুষদের আরও পদবি— ডোম, আঁকুড়ে, বাউড়ি, বীরবংশী, বাদ্যকর।

পেশাগত পরিচয় বহনকারী উপাধিগুলি— কর্মকার, সূত্রধর (ছুতোর), কুম্ভকার, সাধু (বেনে), রুজ (ময়রা), গুঁই, বাড়িতে ঠাকুর আছে তাই— দেবাংশী।

এই গবেষণাধর্মী কাজটি সম্পর্কে আরও অনেক জানবার ও মত প্রকাশের সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

—অনীত রায়গুপ্ত,
পেঁড়ো, হাওড়া।

মুখপাত্র আছেন, মুখপত্র কোথায়?

সদ্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মুকুল রায়, কলকাতায় তিনি সভা করছেন, সেই সভায় বিজেপির রাজ্যসভাপতি আছেন। সংবাদপত্রের পাঠক-পাঠিকাদের তুমুল আগ্রহ সেই সভাকে ঘিরে, কিন্তু পরদিন প্রকাশিত সংবাদপত্রে সেই খবর কতটুকু গুরুত্ব পেল? মুদ্রণ পারিপাট্যে এশিয়ার সেরা কাগজ সেই খবরকে প্রথম পাতায়

কেবল একটু ছুঁয়ে গেল, আর যাঁরা ভগবান ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করেন না, তাঁরা প্রথম পাতায় স্থান দেবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করলেন না।

অস্বীকার করার উপায় নেই, এই কাগজগুলির প্রভাব আছে, শহর ও গ্রামের জনমত গঠনে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই ইন্টারনেট, হোয়াটস্ আপ, ফেসবুকের রমরমার যুগেও মুদ্রিত গণমাধ্যমের প্রাসঙ্গিকতা ফুরিয়ে যায়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি দেশকে নিয়ে ভাবে না, জাতীয়তাবাদ তাদের কাছে নেতির সাধনার সমার্থক, অতএব তা পরিহার্য। হিন্দুত্ববাদ অতীব ঘৃণিত মতাদর্শ। এই মতাদর্শ দেশকে, সমাজকে পশ্চাৎপদ করে, বহুত্ববাদকে বিনষ্ট করে, হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের কোনো ফারাক নেই, সিনেমা দেখতে দেয় না, নির্বিচারে গোহত্যা করতে দেয় না, দলিত দেখলেই জুতোপেটা করে। নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের 'প্রগতিশীল' সংবাদপত্রগুলি এই ধ্রুবপদই ধরেছে, এখন তা ভালভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে।

দুঃখের বিষয়, বাংলায় আজ জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত তেমন কোনো সংবাদপত্র চোখে পড়ছে না। এখানে রোহিঙ্গাদের নিয়ে মুখর হয়ে, চোখের জল ফেলতে বহু পণ্ডিতকেই দেখা যায়। বিজেপির মতো একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের জমানায় সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত নয়। তাঁদের বক্তব্যের মোদ্দা কথা এটাই। সংখ্যালঘু বলতে তাঁরা কেবল ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষকেই বোঝেন। এইখানেই আসে বিজেপির ভূমিকা। বিজেপি বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনভার মুখ্যত এই দলের উপরই ন্যাস্ত। পশ্চিমবঙ্গের মতো অঙ্গরাজ্যেও তার প্রভাব বর্ধমান। গত বিধানসভা ভোটে ১০.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অনেক স্থানে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখছে বিজেপিকে ঘিরে। সিপিএম থেকে, তৃণমূল থেকে বহু মানুষ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে। এই রকম অবস্থায় বিজেপির তরফ থেকে একটি মুখপত্রের বড়ো প্রয়োজন ছিল।

'স্বস্তিকা' যথার্থ সত্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে সততার সঙ্গে এবং সাহসের সঙ্গে তুলে ধরছে। কিন্তু 'স্বস্তিকা'র কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমত এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, দ্বিতীয়ত প্রচারের অভাবে অনেকে এর খবরই রাখে না। সিউরী শহরের বাসিন্দা, আমার এক শিক্ষক বন্ধুকে 'স্বস্তিকা'র কথা বলায় তিনি বললেন— এটি কী ধরনের পত্রিকা? এটি কী সাহিত্য পত্রিকা? তিনি মতাদর্শের দিক দিয়ে জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল। অথচ তিনি স্বস্তিকা দেখেননি।

অপরপক্ষে, কলকাতা, হাওড়ার কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। উলুবেড়িয়া, রামপুরহাট, বজবজ প্রায় সর্বত্র মুসলিম ব্রাদারহুডে বিশ্বাসী 'কলম', দিনদর্পণের মতো কাগজগুলি বিভিন্ন স্টলে দেখা যাচ্ছে। মুসলমানরা কিনছেন, ট্রেনে বাসে পড়ছেন, বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন সযত্নে। তুলে দিচ্ছেন ছেলেমেয়ের হাতে। সেখানে আমাদের খবরের খিদে মেটাতে ভরসা আনন্দবাজার, এই সময়, বর্তমান, আজকাল, প্রতিদিন। তারা যেটুকু খবর দেবে, যা খবর দেবে আমাদের তাই গলাধঃকরণ করতে হবে এবং তার পর ট্রেনে বাসে অফিসে স্কুলে কলেজে জাবর কাটতে হবে। আমাদের মুখপাত্র আছেন, কিন্তু মুখপত্র নেই।

—**উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল,**
শেওড়াফুলি, হুগলি।

যুবরাজের অভিষেক এবং গুজরাটের জনাদেশ

কংগ্রেসের সহ-সভাপতি যুবরাজ রাহুল গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। শতাধিক বছরের একটি রাজনৈতিক দলের কাণ্ডারি পদে বৃত হওয়ায় আপনাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার অভিষেক পর্বটি সুখকর হলো না। গুজরাট এবং হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আপনাকে সভাপতির পদে আসীন হতে হলো। রাহুলজী, আপনার বয়স অল্প। নির্বাচনের এই ফলে হতাশ হবেন না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদবাক্য আছে, যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, ব্যর্থতাই সফলতার সূচক। একথা তো অনস্বীকার্য, আপনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। গত দেড় মাসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুরো গুজরাট চষে বেড়িয়েছেন। ৫২টা জনসভা করেছেন। নোটবন্দি, পণ্য পরিষেবা কর লাগু হওয়া, রান্নার গ্যাসের ভরতুকি হ্রাস প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের নিন্দা করে গুজরাটের নির্বাচক মণ্ডলীকে বিজেপির ২২ বছরের শাসনের অবসানের আহ্বান জানালেন। কিন্তু আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

গুজরাটের মানুষেরও সত্যি বলিহারি। রাহুল দরিদ্রদের পর্ণকুটিরে মধ্যাহ্নভোজ করলেন, তাদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনি শুনলেন, প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি বইয়ে দিলেন। এর পরেও গুজরাটের মানুষ বিবেকহীন! আপনার প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র মায়া দয়া হলো না? তারা সেই নরেন্দ্র মোদীর উপরই আস্থা রাখলেন। আসলে কি জানেন রাহুল গান্ধী, গুজরাট এবং হিমাচল প্রদেশের মানুষ ভাল করেই জানেন, নোটবন্দিজনিত কারণে সাময়িক অসুবিধা হলেও এর একটা সুদূরপ্রসারী সুফল আছে।

আমাদের দেশ আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ হবে। এত পরিশ্রম করেও সাফল্য না পেলে হতাশা আসাটাই স্বাভাবিক, রাহুলজী। ২০১৮ সালে আপনার শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকুক— এই শুভকামনা জানিয়ে এই পত্র শেষ করলাম।

—**সপ্তর্ষি ঘোষ,**
কলকাতা-৯।

পরম্পরা

ভারতে বর্ণাশ্রম-তত্ত্ব ও প্রয়োগ

ড. রনজিৎ কুমার বিশ্বাস

নিখিল ভুবনের সমস্ত প্রাণী জগৎ ও পদার্থ সৃষ্টি, তার স্থায়িত্ব ও উৎকর্ষতার চলমান প্রবাহ ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রণে শৃঙ্খলায়িত। এই শৃঙ্খলা বিরোধী কোনো কর্ম জীব তথা মানুষ ও প্রাণী জগৎ এবং পদার্থের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা রূপান্তর, ছন্দ ও সুষমা ব্যাহত করে, বিনাশ করে। ভারত এই ইন্টারনাল ল' অথবা অর্ডার অব দ্য ইউনিভার্স বহু হাজার বছর আগে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তা এই রূপে ব্যাখ্যা করেছেন : হিন্দুর পক্ষে সমস্ত ধর্মজগৎ নানা রুচি বিশিষ্ট নর-নারীর নানা অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কিছু নয়। প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন, মানুষের

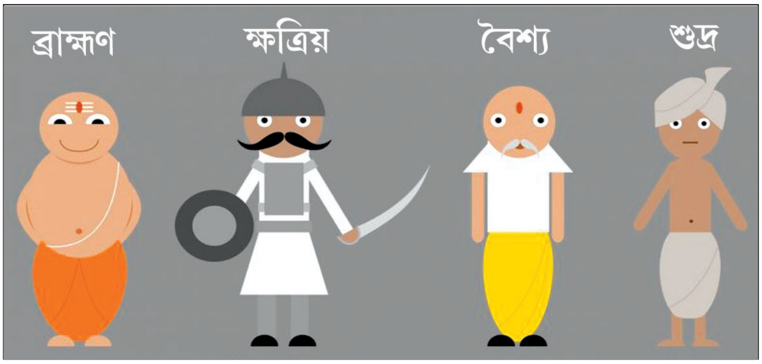

চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা। তবে এত পরস্পর বিরোধী ভাব কেন? হিন্দু বলেন— আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই পরস্পরের বিরুদ্ধভাব ধারণ করে (স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬)।

আরবের বালুকাময় ধূসর ভূমিতে ইসলামের উৎপত্তি। তার ধর্মের ব্যবহারিক অনুষঙ্গ সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, মূত্র ত্যাগ করে লিঙ্গমুখ পরিষ্কার করার জন্য জলের অপ্রতুলতা হেতু সেখানকার লোক এক টুকরো পাথর ব্যবহার করে। সে পাথরের টুকরো সেখানে সর্বত্রই ছড়ানো। ভারতে জলের প্রাচুর্য হেতু এখানে জল দিয়ে ধোয়াই ধর্মের বিধান। আবার শীতপ্রধান দেশের লোক শোষক কাগজ ব্যবহার করে। অর্থাৎ যার যেখানে যেটি সুবিধাজনক সেটি করে। মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকা, স্বাস্থ্যসম্মত থাকা। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন যদি ব্যবহারিক বৈপরীত্যকে অস্বীকার করে সর্বত্রই সবার জন্য অলঙ্ঘনীয় বিধি তৈরি করে দেয় তা মানা কঠিন, মানলে রিলিজিয়ন হয়তো রক্ষা পায় কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ হয়।

ভারতবর্ষ আবহমানকাল থেকে নানান মুনি, ঋষি, মানুষের উপদেশ, জীবনচর্যা সাধারণ মানুষ অনুশীলন করার চেষ্টা করেছে। সামাজিক জীবনে বহুত্বকে পাশাপাশি রেখে অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে দেশকে উপরে রেখেছে। জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী হিসেবে প্রণাম করেছে।

এই ছন্দবদ্ধ সমাজের মানুষের পেশাকে মানদণ্ড ধরে কোনো শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভাগ হয়ে পড়েছে। আমরা নিশ্চয় বিশ্বাস করব এই ভাগ বংশপরম্পরায় স্থায়িত্বের বিধান নয়। এখন যেমন কৃষকের ছেলে ডাক্তার হচ্ছে, তাদের আমরা আর কৃষক বলি না, ডাক্তারই বলি। আবার হয়তো ডাক্তারের ছেলে ব্যবসা করছে। তাদের আমরা অবশ্যই ব্যবসায়ী বলব। সুতরাং এই ভাগ পেশাভিত্তিক এবং পেশার পরিবর্তনের সঙ্গে নামকরণও পরিবর্তনশীল। এটাই যুক্তিযুক্ত এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা অন্যরকম করে সমাজে বিভেদের স্থায়িত্ব দেবেন এটা বিশ্বাস করা যায় না। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম গ্রন্থিত থাকে। এই উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য আরও কিছু নিয়ম কানুন বা বিধি তৈরি করার দরকার হয়। আবার এর বাইরেও এমন অবস্থা কখনও কখনও উপস্থিত হয় যা লিখিত বা ঘোষিত নিয়ম বা বিধি দিয়ে বিচার করা যায় না। তখন জ্ঞান ও বিচার মতে যা সঠিক মনে হয় সেই সিদ্ধান্তে আশা যেতে পারে যা প্রতিষ্ঠানের মুল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে না, হবে সহায়ক।

বহু বহু বছর ধরে চর্চিত বর্ণাশ্রম প্রথা এক জগদ্দল পাথর হয়ে হিন্দুধর্মের বুকের পরে বসে হিন্দুধর্মের শ্বাসরুদ্ধ করে দিচ্ছে। বর্ণাশ্রম প্রথায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত শূদ্রেরা যা হিন্দুধর্মের সিংহভাগ। একজন হিন্দুর ধর্মীয় ধাপে অবস্থানের সঙ্গে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ এবং সামাজিক মর্যাদা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বিবেকানন্দ বলেছেন— অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্র আর্য সভ্যতার তাঁত। আর্যপ্রধান, নানারকম সুসভ্য, অর্ধসভ্য মানুষ এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে বর্ণাশ্রমাচার এবং পোড়েন হলো প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিবারণ (বাণী ও রচনা—ষষ্ঠ খণ্ড, প. ২১০)। বিবেকানন্দের এই বর্ণাশ্রম নিশ্চয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। যোগ্যতার ভিত্তিতে বর্ণাশ্রমের সিড়িতে কেউ নিম্নধাপ থেকে সর্বোচ্চ ধাপ যথা ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারে, আবার পরবর্তী প্রজন্ম যোগ্যতা হারিয়ে নীচের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের ধাপে নেমে যেতে পারে। যেমন কর্পোরেট হাউসে কেউ হয় ম্যানেজার, ডিরেক্টর, করনিক, নিরাপত্তারক্ষী ইত্যাদি। ডিরেক্টরের সন্তান যেমন ডিরেক্টর হবেই আবার নিরাপত্তা রক্ষীর ছেলে নিরাপত্তা রক্ষীই হবে তা যেমন সত্য নয়, তেমনি বর্ণাশ্রমের অবস্থানও যোগ্যতার ভিত্তিতে

সতত পরিবর্তনশীল। এই ব্যাখ্যা ও বিবেচনাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই অস্থায়ী নামকরণ বা ধাপপ্রাপ্তি বংশানুক্রমিক যা বহু বছর ধরে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণই হবে যদি তার মধ্যে সামান্য ব্রহ্মজ্ঞান নাও থাকে, আবার শূদ্রের ছেলে রকেট বিজ্ঞানী হলেও শূদ্রই থেকে যাবে। রাজনৈতিক ভাষায় বলা যায়--- কিছু সুবিধাভোগী ধর্ম ব্যবসায়ীদের দ্বারা সমাজের জন্য অশেষ ক্ষতিকারক প্রথা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, উচ্চনীচ ভাবনা ও গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতার প্রচার ও প্রসার হয়েছে। ভারতের যে মূল চালিকাশক্তি যাকে পণ্ডিত দীনদয়ালজী 'একাত্ম মানবতাদর্শন' বলেছেন তার ঘোর পরিপন্থী। এই অসাম্য, এই পাপ আমাদের এমনভাবে বেষ্টন করে রেখেছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি, মনীষী বা সমাজ পর্যবেক্ষকরা এর ভয়াবহতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেও আমরা এই যন্ত্রণার থেকে মুক্ত হতে পারিনি। ভারতের সহিষ্ণুতা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য...শক হুনদল মোগল পাঠান এক দেহে হল লীন', তাকে পরিহাস করছে। ইংরেজিতে একটা কথা বলা হয়— চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম অথচ আমরা আমাদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত মানুষের মধ্যে সমভাব সৃষ্টি করতে পারলাম না। বৌদ্ধিক চর্চার মাধ্যমে সাম্য ও মর্যাদার প্রচুর উপদেশ, বাণী বা বহু গুণী মানুষের বিচারধারার উদাহরণ হয়তো আমরা রাখতে পারছি কিন্তু ভেদ বা গোষ্ঠী নির্মূল করতে আমরা যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছি না বা নিতে পারছি না, সদিচ্ছা নিশ্চয় আছে তা সত্ত্বেও।

বিভিন্ন সময় ধর্মীয় গুরুরা হিন্দু ধর্মের সম্প্রদায়গত বিভেদ ও তার কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছেন। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এই ভারতবর্ষের হিন্দুভূমিতে সৃষ্টি হয়েছে। এরা ভিন্ন ধর্মের মানুষ হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়। রাষ্ট্রীয় ভাবে তা গ্রাহ্য হলেও ধর্মীয়ভাবে এই ধর্মের স্রষ্টাদের আমরা হিন্দুমতে অবতার বলি এবং হিন্দুদের অসংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এদের অবস্থান হিসেবে গণ্য করি। অর্থাৎ হিন্দুত্বের মহাসাগরে পতিত হওয়া অসংখ্য নদী, উপনদীর মতো এঁরা।

কিন্তু বাস্তব এই যে, যত বিভিন্নতা সে পেশা হোক, ধর্ম হোক, ভাষা হোক, দূরত্ব তৈরি করবেই। হিন্দুত্বের মহা-আবরণের প্রথাগত ছায়ায় সুস্থির থাকা বা রাখা এক কঠিন কাজ নয় কি? কবি নজরুল বলেছেন— কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল করলে লোপাট'! বিভেদের এই প্রাচীর ভেঙে লোপাট করা দরকার। কালের নিয়মে হয়তো বর্ণাশ্রমের অপব্যাখ্যাজনিত দুরারোগ্য ব্যাধি, স্বামী বিবেকানন্দ যাকে কর্কটরোগ বলেছেন, সে হয়তো নির্মূল হবে। কিন্তু তার জন্য হাজার বছর ধরে এই ভারতবর্ষের অগণিত মানুষকে যন্ত্রণা, অপমান সইতে হবে। ভারতমাতাকে নিয়তই তার সন্তানদের বেদনায় ব্যথিত হতে হবে।

এখনও ভারতবর্ষে অনেক স্থানে এক কুঁয়োর জল সব হিন্দু গ্রহণ করতে পারে না। এক মন্দিরে পুজো দিতে পারে না। উঁচু জাতের পাড়া দিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষেরা ছাতা মাথায়, জুতো পায়ে, পাগড়ি পরে, ঘোড়ায় চড়ে গেলে এমনকী গোঁফ রাখলেও তাদের অহমিকায় আঘাত লাগে। উচুজাত, নিম্নজাত শ্রেণী বিন্যাসে ছাত্রাবাসে আলাদা খাবার ব্যবস্থা, এমনকী পুলিশেও। সামাজিকভাবে এক পংক্তিতে খেতে পারে না বহু জায়গায়। ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিয়ে করার জন্য কত যুবক-যুবতীর প্রাণ যায়। এখনও বিহার বা উত্তরপ্রদেশে দলবেধে ধর্মান্তর হওয়ার ঘটনা ঘটে। গুজরাটে চর্মকারদের স্বাভাবিক পেশা গোরুর চামড়া ছোলার জন্য লাঞ্ছিত হতে হয়। এসব ছাড়া সমাজের সর্বত্র কথিত অকথিত রূপে বর্ণবাদের কুৎসিত অনাচার যথেষ্ট বিদ্যমান।

সরকারি উদ্যোগে ইংরেজ আমলের শেষের দিকে নিম্নবর্ণের মানুষদের রাজনৈতিক ও চাকুরিতে সংরক্ষণ শুরু হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ভাতা দেওয়ারও কিছু বন্দোবস্ত হয়। উদ্দেশ্য নিম্নবর্ণের মানুষদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে তপশিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য সংখ্যা ভিত্তিক সরকারি চাকুরি এবং রাজনীতিতে সংরক্ষণ চালু হয়েছে। যদিও ড. আম্বেদকর এটা ১০ বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করতে বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এটা শুধু স্থায়িত্বই পায়নি, নতুন নতুন সম্প্রদায় যাদের ওবিসি বলা হচ্ছে তারা এমনকী মুসলমানদের জন্যও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। কিছুটা রাজনৈতিক কারণে এবং অনেকটা প্রকট সামাজিক বৈষম্যের জন্য এটা করা দরকার হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো একে আপৎকালীন ব্যবস্থা বই কিছু ভাবছে না। এই আপৎকালীন ব্যবস্থা যে বর্ণাশ্রম প্রথার অপপ্রয়োগ আরও শক্তপোক্ত ভিতের পরে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে সেদিকটা বিবেচনায় আনতে আমরা অবহেলা করছি। যদি ধরেনি এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সব সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নতি হবে এবং সামাজিক বৈষম্য ও পীড়ন ভবিষ্যতে বন্ধ হবে, কিন্তু তা কতদিনে? প্রায় ১০০ বছরের চর্চার মাধ্যমে আমরা কিছুটা উন্নতি নিঃসন্দেহে করেছি কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ সাম্য আসতে কয়েকশো বা কয়েক হাজার বছর লেগে যেতে পারে।

এমনটা কি হতে পারে না আমরা কোনো এক স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাতে বর্ণ বিভেদের মূল উৎপাটনের জন্য কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিলাম? হতে পারে তা নতুন ভূমিষ্ঠ শিশুদের পরিচয় হবে তার নামের সঙ্গে বাবা বা মায়ের নাম জুড়ে দিয়ে, যেমন দক্ষিণ ভারতে এর অনেকটা চল আছে। পদবি সম্পূর্ণ বর্জিত হলো। পদবি আমাদের বর্ণ গোত্রের অনেকাংশে পরিচয় জ্ঞাপক এবং বিভেদের প্রাথমিক ধাপ এবং তার চলমান ঘোষণা। যদি পদবি নামের সঙ্গে রাখতেই হয় তবে সে পদবি ভারতীয় ভাষা অনুসারে সৃষ্টি করা যেতে পারে। পুরোনোগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ পদবির এক ভাণ্ডার তৈরি হলো। কম্পিউটারের মাধ্যমে নবজাতকের জন্মের সময়ই সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই পদবি বিতরণ করা যেতে পারে। ডিজিটাল ভারতবর্ষে এই কাজটা করা একেবারেই কঠিন নয়। এই নবজাতকের পরের প্রজন্ম এই পদবি ব্যবহার করতে পারবে। এভাবে সম্প্রদায়ভিত্তিক পদবি পরিহার করে আমরা অনেকটা বিভেদমুক্ত হব।

(লেখক কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন
দশাবতার তাস

চূড়ামণি হাটি

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর হাম্বীর গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের মত নিয়ে, ওড়িশায় প্রচলিত গোল তাস খেলার অনুকরণে প্রাক্‌ষোলো শতকে বিষ্ণুপুরে দশাবতার তাস খেলা চালু করেন। ওড়িশার সাংস্কৃতিক প্রভাবে বুদ্ধ অবতারের পরিবর্তে জগন্নাথ অবতার গুরুত্ব পায়। বলাবাহুল্য বিষ্ণুর অবতারের তালিকা নিয়ে নানা অসঙ্গতি আছে। বারো শতকের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে বর্ণিত বিষ্ণুর দশাবতার গুরুত্ব পেয়েছে।

ওড়িশার গোল তাসের নাম বারোরঙ্গ। বিষ্ণুর দশাবতারের সঙ্গে কার্তিক ও গণেশ। বিষ্ণুপুরের গোল তাস দশাবতার তাস নামেই পরিচিতি। বারো সেটে বিন্যস্ত মোট আটচল্লিশটি তাস নিয়ে নকশা তাস তেমন জনপ্রিয় হয়নি। বত্রিশ বা চৌষট্টি তাস নিয়ে অষ্টমল্ল খেলাটিও গুরুত্ব পায়নি। দশাবতার তাসের চিত্রিত বিষয় বিষ্ণুর দশ অবতার ও তাদের প্রতীক। দশাবতার তাসের গুরুত্ব দৈব-শক্তি ও চিত্র সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে। নক্সাতাসের গজপতি সাহেব অশ্বপিঠে বিবির গুরুত্ব পেল।

শোনা যায়, মল্লরাজ বীর হাম্বীর রাজ সেনা কার্তিক ফৌজদারের উপর দশাবতার তাস তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সে সময় যে সকল সূত্রধর সর্দার দশাবতার তাস তৈরিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তারা পেলেন 'ফৌজদার' রাজ-পদবি। কথিত আছে এদের বাস ছিল লাউগ্রামে। বিষ্ণুপুরে সূত্রধররা দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন টেরাকোটার মন্দির ও কাঠের রথ-মূর্তি ও অন্য সামগ্রী তৈরিতেও। দুর্গা পট ও চালচিত্র অঙ্কণেও সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ যেন পটুয়া-চিত্রকর গাইনদের পাশাপাশি আর একটি ধারা। বর্তমানে ফৌজদারদের কাছে দশাবতার তাস তৈরি প্রধান জীবিকা নয়; প্রধান জীবিকা তাঁত বোনা, কাঠের কাজ ও কৃষিকাজ।

সাড়ে চার ইঞ্চি ব্যাস নিয়ে গোলাকার তাস। সুতির কাপড় ভালো করে ধুয়ে তেঁতুল বিচির আঠা দিয়ে কয়েক ভাঁজ পুরু করে জুড়ে নেওয়া হয়। শুকিয়ে গেলে দু-পিঠে শিল-নোড়ায় ভালো করে গুড়ো করা খড়িমাটির প্রলেপ চাপানো হয়। তারপর নুড়ি পাথর দিয়ে ঘসে দু-পিঠ সমতল করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট মাপের চাকতি বসিয়ে গোল করে কেটে নেওয়া হয়। প্রায় প্রস্তুত তাসটির এক পিঠে রঙ-তুলিতে ফুটে ওঠে দশাবতার তাসের নির্দিষ্ট অলঙ্করণ। পুষ্পিকা চিহ্নের প্রয়োগও লক্ষণীয়। রং-আঠা সবই প্রাকৃতিক উপকরণ থেকে তৈরি। বলা হয় এক সময় পাটরাঙা সম্প্রদায় এ রং তৈরি করতো। যাইহোক, সবশেষে উল্টো পিঠে গালা ও মেটে সিঁদুরের প্রলেপ লাগানো হয়। তাসটি হয় শক্ত। খেলার উপযুক্ত।

বিষ্ণুর দশ অবতার অনুসারে তাসের মূল পিঠ বা ভূমির রংও বদলে যায়। মীন অবতার : প্রতীক মাছ, ভূমি কালো। কূর্ম অবতার : প্রতীক কচ্ছপ, ভূমি খয়েরি। বরাহ অবতার : প্রতীক শঙ্খ, ভূমি সবুজ। নৃসিংহ অবতার : প্রতীক চক্র, ভূমি ধূসর। বামন অবতার : প্রতীক কমণ্ডলু, ভূমি নীল! পরশুরাম অবতার : প্রতীক কুঠার, ভূমি সাদা। রাম অবতার : প্রতীক বাণ, ভূমি লাল। বলরাম অবতার : প্রতীক গদা, ভূমি হালকা সবুজ। জগন্নাথ অবতার : প্রতীক পদ্ম, ভূমি হলুদ। কল্কি অবতার : প্রতীক খড়্গ, ভূমি হালকা লাল। রাম, পরশুরাম, বলরাম, জগন্নাথ, কল্কী অভিজাত। মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন হলেন অন্ত্যজ। অর্থাৎ অভিজাত তাস ও অন্ত্যজ তাস। যখন অবতার মন্দির বা সিংহাসনে দুই সেবক নিয়ে অবস্থান করছেন; সে তার রাজা তাস। অর্থাৎ দশ অবতারের দশটি রাজা তাস। আর যখন অবতার মন্দির- সিংহাসন ছাড়া একা; সে তার মন্ত্রী বা উজির তাস। অর্থাৎ দশ অবতারের দশটি উজির তাস। এই হলো দশ ও দশে মোট কুড়িটি তাস। বহুবর্ণ মূর্তি অঙ্কণের দক্ষতা নিয়ে এ তাসগুলি সমৃদ্ধ।

আর আছে প্রত্যেক অবতারের দশটি করে মোট একশোটি প্রতীক তাস বা ফোঁটা তাস বা রং তাস। চিত্রিত হয় কোনো এক অবতারের প্রতীক বা প্রতীকগুচ্ছ। একটি প্রতীক চিহ্ন নিয়ে এক্কা, দুটি নিয়ে দরি; এরকম তিরি, চৌকা, পঞ্জা, ছক্কা, সাত্তা, আটা, নক্কা, দশ। অভিজাত প্রতীক তাসের থেকে প্রতীক সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ শক্তি-ফোঁটা কমাতে থাকা অর্থাৎ এক্কা বড়। অন্ত্যজ প্রতীক তাসের ক্ষেত্রে প্রতীক সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ শক্তি-ফোঁটা বাড়তে থাকা অর্থাৎ দশ বড়। কিন্তু সবার উপর রাজা; তার পর উজির তাস। সব নিয়ে একশো কুড়িটি তাস। পাঁচ জন খেলোয়াড়। কেউ কারোর জুটি নয়। প্রত্যেকের হাতে চব্বিশটি তাস। শুদ্ধাচারে ভগবানকে স্মরণ করে খেলা শুরু। সময় বিশেষে খেলার শুরুটা অদ্ভুত। সূর্য ওঠার সময় জগন্নাথ অবতারের তাস দিয়ে খেলা শুরু হয়; সূর্য উঠে গেলে রাম অবতার, সূর্য ডোবার সময় নৃসিংহ অবতার, সূর্য ডুবে গেলে মৎস্য অবতার, বৃষ্টি হলে কূর্ম অবতারের তাস দিয়ে শুরু। যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো এক অবতার রাজের জয় হচ্ছে ততক্ষণে খেলা চলে। জটিল নিয়ম বা জটিল যুদ্ধ। আজ এ খেলার চল নেই। কিন্তু লৌকিক সমাজে চর্চিত এই শিল্পচর্চাটি আঞ্চলিক ঐতিহাসিক-স্মৃতি চিহ্ন হয়ে বেঁচে রইলো।

মেয়েরা মেয়েদের পাশে থাকুন

অর্পণা দে

মহিলারাই মহিলাদের শত্রু বলে অযৌক্তিক প্রচার বন্ধ করার জন্য মহিলাদেরই মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। বিয়ের আগে ঘরের মহিলা সদস্যরা অর্থাৎ মা, ঠাকুমা, কাকিমা, জেঠিমা, পিসিমা-রা কন্যা ও পুত্র সন্তানের পরিচর্যার ক্ষেত্রে বৈষম্য না করে উভয়কে সমান দৃষ্টিতে প্রতিপালন করতে পারেন। পুত্রসন্তানকে পুরুষ হিসেবে তৈরি না করে উভয়কেই প্রকৃত মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তৈরি করার চেষ্টা করতে পারেন। কন্যাটিকে যেমন ঘরের সব কাজে পারদর্শী করে তুলবেন, পুত্রটিকেও সমানভাবে ঘরের সব কাজ শেখাবেন। পরিবারের সকলের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন, সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষায় উভয়কে জারিত করবেন, কেবলমাত্র কন্যাটিকেই নয়, পুত্রটিকেও। কন্যাটিকেই বিয়ের জন্য প্রস্তুত

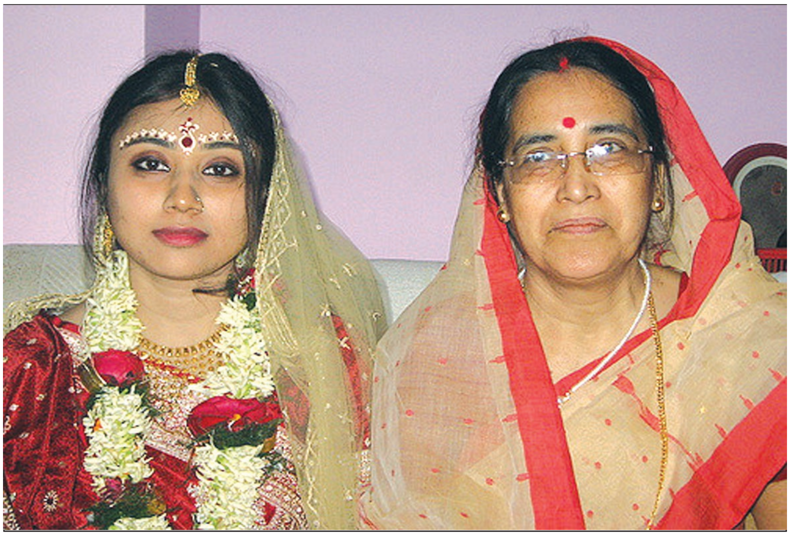

করার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রটিকেও তৈরি করবেন। পুত্রটিকে ভাল স্কুলে পড়ালে কন্যাটিকেও ভাল স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা করবেন। কারণ, সুযোগ-সুবিধা পেলে কন্যাটিও পুত্রটির মতোই তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে। কন্যার বিয়ে বাল্যবয়সে না দেওয়ার জন্য ঘরের কর্তাব্যক্তিকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবেন, বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে তাকে অবগত করবেন। পরিবারের বয়োঃজেষ্ঠ্য মহিলারা নিজেদের জীবনে যেসব বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, সেগুলি যেন নবজাত কন্যাসন্তানটিকে ভোগ করতে না হয়, সে চেষ্টা করবেন। কন্যাটির প্রতি পরিবারের পুরুষ সদস্যের দ্বারা বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিহত করতে হবে মহিলা সদস্যদেরই। কন্যার বিয়েতে প্রচুর পণ দিয়ে বহু টাকা খরচ করা হলেও পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য মা-সহ পরিবারের মহিলা সদস্যরা সচেষ্ট হবেন। এক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই পুত্রসন্তানকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে বোনের যে সমান অধিকার রয়েছে, সেই বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করবেন বড়রা। যাতে বড় হয়ে পুত্রটির মধ্যে তার বোনকে নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মানসিকতা তৈরি না হয়।

ছোটবেলা থেকেই কন্যার বিয়ের জন্য টাকা না জমিয়ে, ছেলে সন্তানকে জীবনে স্বাবলম্বী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেভাবে চেষ্টা করেন, সেভাবে কন্যাটিকেও স্বাবলম্বী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পিতামাতার সচেষ্ট হওয়া উচিত। পণ দেওয়া ও নেওয়া দুটোই নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আইনত ও সামাজিক অপরাধ— এই বিষয়টি ছেলে ও মেয়ে উভয়কে ছোটবেলা থেকেই বোধগম্য করাতে হবে।

একজন নববধূ যখন শ্বশুরবাড়ি আসেন, তখন শাশুড়িমাকে উদার মনে তাকে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ছেলেটির জীবনে বধূটি অপরিহার্য বলেই সে বিয়ে করে ঘরে বধূ এনেছে। নববধূকে যথাযথ মর্যাদা, স্নেহ, ভালাবাসা দিয়ে তাকে শ্বশুরবাড়ির একজন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। নববধূ নিজের মা-বাবাকে ছেড়ে একটি নতুন পরিবেশে এসে অসহায় বোধ করে, শাশুড়িমা তার মা হয়ে কাছে টেনে নিলে তার পক্ষে সহজ হয় নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে। নববধূটিও আগের থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন বিশেষ করে শাশুড়িমায়ের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব নিয়ে থাকলে চলবে না, তাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রেখে চলতে হবে। শাশুড়িমা যেমন নববধূকে বাড়ির নিয়মকানুনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় দেবেন, তেমনি নববধূও শ্বশুরবাড়ির নিয়মাবলীকে যুক্তিবিচারে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে, সেগুলি গ্রহণ করবেন। দু'টি ভিন্ন পরিবারের লোকেরা অসহিষ্ণু হলে বধূটির পক্ষে নতুন অভ্যাস তৈরি করতে অনেক সমস্যা হয় এবং পারিবারিক অশান্তির সূত্রপাত ঘটে।

বহু পরিবারের স্বামী নেশাগ্রস্থ হয়ে বাড়ি এসে স্ত্রীকে মারধোর করেন। এ অবস্থায় শাশুড়ি ননদ, জা নীরব দর্শক হয়ে না থেকে স্বামীর আক্রমণ থেকে মহিলাটিকে রক্ষা করতে পারেন। স্ত্রীকে মারধোর করে সংসারে শান্তি আসে না— এই কথাটা স্বামীকে বোঝাতে হবে। পরিবারের মহিলা সদস্যরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বধূটির পাশে থেকে তার ওপর স্বামীর আক্রমণ, অত্যাচার প্রতিহত করতে পারেন নিশ্চিতভাবেই।

(লেখিকা সদস্য সচিব, ত্রিপুরা মহিলা কমিশন)

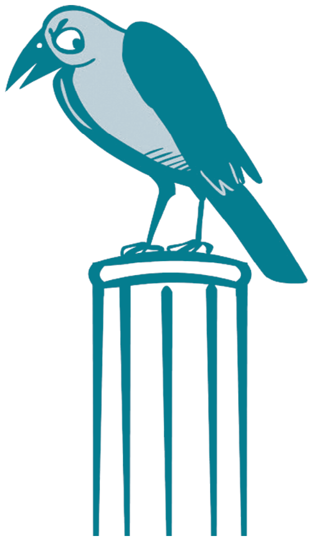

রাহুলবাবা পার করেগা

মেঘের কোণে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি। তাই ভারতগগনে পুনঃ রাহুল উদয়। ব্রাহ্মণ বীরের বেশে তুমি করলে গুর্জর জয়, একি গো বিস্ময়! পরাজিত সম্রাট রাহুলজী এবার খোদ বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার মতো মোদীজীর হোম গ্রাউন্ড গুজরাটে একটি মহান ‘মর‍্যাল ভিক্টরি’ অর্জন করেছেন। ফলে মোদীজীর গেরুয়া ভিক্টরি যে ইম্মর‍্যাল হয়ে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই ইউপিএ আমলের স্ক্যাম জর্জরিত মহামর‍্যাল পার্টি, গান্ধী কংগ্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেডের অনুগত বীরবৃন্দের মধ্যে উল্লাসের ধুম পড়ে গেছে— রাহুলবাবা পার করেগা।

গুজরাটে এই মহান মর‍্যাল ভিক্টরির মাঝখানে যে হিমাচল প্রদেশে ভরাডুবি, সেটা মর‍্যাল না ইম্মর‍্যাল, সে সম্বন্ধে কিন্তু রাহুলপ্রেমে মাতোয়ারা কংগ্রেসিদের কোনও উচ্চবাচ্য নেই। আসলে অত ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে আর বৃহৎ ব্যাপারে চিন্তা করার সময় থাকে না। যাক যাক, যা গেছে তা যাক। দ্বিজেন্দ্রলালের ‘শাজাহান’ নাটকে আওরঙ্গজেবের উক্তিই আমাদের সামনে— একটা নদী পার হয়েছি, সম্মুখে আরও একটা নদী, ভীষণ, ভয়াল ও তরঙ্গসঙ্কুল; কিন্তু পার হতে হবে এবং এই নৌকো নিয়েই।

আমাদের সেই পরিত্রাণকারী নোয়ার নৌকোটি হলো কংগ্রেসের এই উপবীতধারী নব্যব্রাহ্মণ রাহুলজী। এতদিন এই পবিত্র পৈতেটি সেকুলারিজমের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল, আজ দেখ তাহার অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ। গ্রামে-গঞ্জে দেখা যায়, কানে পৈতে দিয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি করতে, তবে কানে পৈতে দিয়ে ভোটভিক্ষা বোধহয় এই প্রথম। আসলে গান্ধী কংগ্রেসের জপমন্ত্র সেকুলারিজমের মূলে আছে অ্যাপিজমেন্ট পলিসি। এতদিন পির-মোল্লা তোষণ করে কাজ চলছিল; কিন্তু বহুল ব্যবহারে সেই অস্ত্রটি ভোঁতা হয়ে যাওয়ার পর এখন কংগ্রেসি থিংক ট্যাঙ্কের কৌশলী স্ট্র্যাটিজিতে একটু সফটি হিন্দু অ্যাপিজমেন্টের ভোল বদলের পালা। তার ফল হাতে হাতে, গুজরাটে মর‍্যাল ভিক্টরি। প্রেসিডেন্ট হয়েই যদি এই মির‍্যাকল হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ যে কী পরিমাণ মির‍্যাকুলাস হবে তা সহজেই অনুমেয়।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার সময়ে অবশ্য একটু কূট কচালি হয়েছিল। মহান নেত্রী ইটালিয়ান গান্ধীর রেকর্ড সৃষ্টিকারী প্রেসিডেন্সির পর যে তাঁর শিবভক্ত সন্তান দীর্ঘদিন ‘ভাইসটাইটে’র মধ্যে আবদ্ধ থাকার পর এখন প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হবেন, তা স্বতঃসিদ্ধ। না তিনি ব্রিটেনের কুইন এলিজাবেথের মতো প্রিন্স চার্লসের বার্ধক্য সত্ত্বেও রানিগিরি বজায় রাখতে রাজি নন। ইটালিয়ান গান্ধী কিন্তু ‘রাজমাতা’ হওয়ার গৌরবের আশায় স্বেচ্ছাবসর নিয়ে এক বিরল নজির সৃষ্টি করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, গান্ধী কংগ্রেসের ডাইন্যাস্টিক ডেমোক্র্যাসির মহিমায় দলে একটিও চ্যালেঞ্জার না থাকায়, সারা ভারতের সর্বসম্মতিক্রমে নবকুমারের প্রেসিডেন্টরূপে অভিষেক। এটা আমেরিকা নয় যে, প্রাইমারি সেকেন্ডারি, সেমিফাইন্যালের পর্ব শেষ করে তবে ফাইন্যালের ভোট। মনে থাকে যেন Incredible Indian Democracy এর এক মহান ঐতিহ্য।

সে কথাটাই আমাদের রাজীবজীর বন্ধু মণিশঙ্কর আইআরদা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, শাজাহানের পর যে ঔরঙ্গজীব সম্রাট হবেন এটাই স্বাভাবিক। কারণ সে সময় তো গণতন্ত্রের কোনও বাহানা ছিল না। সেকুলার ঐতিহাসিকদের কাছে ঔরঙ্গজীব একজন মহান ব্যক্তি। কেননা তিনি বামপন্থী স্যালিনের মতো সহযোদ্ধাদের খতম নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ভায়েদের মুণ্ডু নিয়ে গেন্ডুয়া খেলেছিলেন। অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী কংগ্রেসে অবশ্য ওসবের বালাই নেই, ইলেকশনের পরিবর্তে সিলেকশনই তার নিয়ম। কংগ্রেসে কেবল দু’বারই ইলেকশন হয়েছিল; একবার গান্ধীজীর আমলে, গান্ধীবাদী পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, কিন্তু টিকতে পারেননি। আর একবার নেহরুজীর আমলে, নেহরুবাদী বিরোধীকে হারিয়ে ট্যান্ডন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, কিন্তু মহান নেহরুর চাপে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে নিষ্ক্রান্ত হন।

তবে কংগ্রেসের সেই আদিম গান্ধীযুগে মোতিলালজীর পর জওহরলালজী এবং আধুনিক গান্ধী যুগে ইন্দিরাজীর পর রাজীবজী এবং সোনিয়াজীর পর যে রাহুলজী প্রেসিডেন্ট হবেন সেটাই তো ঐতিহ্যের পরম্পরা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ‘ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত’। গান্ধী-কংগ্রেসের গান্ধীরা তেমনি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার জন্য জন্ম হইতেই বলি প্রদত্ত। রাহুলজীর প্রেসিডেন্ট হওয়া সেই গান্ধী ঘরানারই পরম্পরা। এখন কেবল প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশসেবা করাটাই বাকি।

রাজনীতিতে ব্যাপটিজমের পর পরই রাহুলজী দুটি বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন। একটি নরসিমহা রাওয়ের বদলে গান্ধী পরিবারের উত্তরসূরী ক্ষমতায় থাকলে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হতো না এবং তিনি ইচ্ছে করলে যে কোনওদিন প্রধানমন্ত্রী হতে

পারেন, একটু টাইম নিচ্ছেন এই যা। কিন্তু টাইম নিতে নিতে কেসটা একটু জটিল হয়ে গেল বটে। তবে অবশেষে যখন সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হওয়া গেছে, তখন প্রধানমন্ত্রী হতে আর কতক্ষণ!

প্রেসিডেন্ট হয়েই যখন গুজরাটে গেরুয়া জমানাকে এক 'জবরদস্ত ধাক্কা' দেওয়া গেছে তখন মারো জোয়ান হেঁইও বলে সারা দেশে ধাক্কা দেওয়া তো কেবল সময়ের অপেক্ষা। কংগ্রেসি পিতামহরা থেকে আরম্ভ করে যুবরাজ নেতারা অবধি সকলেই একবাক্যে রামধুন গাইছেন যে, রাজনীতির অঙ্গনে যে নব ব্রাহ্মণের উদয় হয়েছে, তাঁর গৌরবচ্ছটাই ক্রমে ভারত মহাসাগর অবধি বিস্তৃতি লাভ করবে। কংগ্রেসের এই যুগাবতার যেভাবে লাল তিলক কেটে গলায় মালা পরে গুজরাটে দ্বার হতে দ্বারে ফিরে ফিরে দেশের ও হিন্দুত্বের বিকাশের ধ্বজা তুলে ধরেছেন, তাঁকে আর ঠেকায় কে! পিতা রাজীব একবার সাহ বানো মামলায় সংবিধান সংশোধন ও রাম মন্দিরের দরজা খুলে দিয়ে দুদিক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বোফোর্সের কামানের গোলায় সে সবই বিফলে যায়।

গুজরাটে গেরুয়া শাসনকে জবরদস্ত ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও সে যে মৃদু ভূকম্পের মতো মিলিয়ে যেতে বাধ্য হয় সে এক রহস্য। আসলে সাতাশ বছরের 'মওত কা সওদাগরের' রাজত্বের অবসানে ভিক্টরি ছিনিয়ে আনতে না পেরে, যে শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা পুরস্কার মর‍্যাল ভিক্টরিতে সন্তুষ্ট থাকতে হলো, সে এক তাজ্জব কি বাত। এমনকী মোদীরাজের দুঃশাসনে স্বেচ্ছাচারে, ডিমানিটাইজেশান এবং গব্বর সিং ট্যাক্সের মতো দুই মহাদানবের অত্যাচার সত্ত্বেও, নেতৃত্বের মহিমায় ভোটের বাজারে হেরে ভূত হয়ে মুখ পোড়ানো ছাড়া আর উপায় রইল না। এমনকী সোমনাথের মন্দিরে মালা চড়িয়েও শিবকৃপাহি কেবলম্ করেও কৈবল্যলাভ ঘটলো না।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও চারিদিকে কংগ্রেসিদের বাহবা বাহবা নন্দলাল বলে ব্রেক ডান্সের আর সীমা নেই। স্মরণে থাকতে পারে, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে পাকেচক্রে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের কিছু আসন সংখ্যা বাড়ায়, চারিদিকে রব উঠল অবশেষে রাহুলজীর উদয়। কিন্তু সেই উদয় মাত্র পাঁচ বছর পরে মোদীঝড়ে একেবারে ধূলিসাৎ। এবারেও সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে মহাঘোট বন্ধনের যোগবিয়োগের ফলে, হাতে রইল শূন্য। কারণ অপদার্থ নেতৃত্বে শূন্যের সঙ্গে শূন্য যোগ করলে শূন্যই থাকে। যদি না বিপক্ষে জনতার অনাস্থা তাকে পূর্ণ করে তোলে।

কিন্তু সেই জনতার অনাস্থাকে স্বপক্ষে আস্থায় পরিণত করতে গেলেও নেতৃত্বের মুনশিয়ানার যে প্রয়োজন সেকথা এই কংগ্রেসি নবোদয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বোঝায় কে! গুজরাটেই তার প্রমাণ। কেননা সেখানে শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি গ্রামবাসীদের ক্ষোভ কিন্তু নগরবাসীর সমর্থনে কাটাকাটি হয়ে গেছে। একদিকে কৃষিভিত্তিক গ্রামের ক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নবীন তপস্বী হার্দিক প্যাটেলের পতিদার আন্দোলন; জিগনেশ মেওয়ানির দলিত আন্দোলন ও অল্পেস ঠকরের ওবিসি আন্দোলন। এই হার্দিক, অল্পেশ ও জিগনেশ এককাট্টা হয়েছিল, বঞ্চিতদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দাবিতে, যার মধ্যে রাজনৈতিক চালাকি অপেক্ষা মানুষের জীবিকা ও জীবনের দাবি ছিল প্রবলতর। সেটা অনায়াসেই আমজনতার হৃদয় দুয়ারে কড়া নাড়ে। গ্রামাঞ্চলে জীবন-জীবিকার দাবিতে শাসকদের প্রতি অনাস্থাই বিরোধী কংগ্রেসের ভোটের ঝুলি ভারী করে। তাতে অবশ্য ঝড়ে কাক মরলে ফকিরের কেরামতি আবিষ্কার করা খুবই সম্ভব।

গুজরাটে সেই ১৯৮৫ সালে কংগ্রেসের জয়ের পর এতদিন তাদের শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে তাদের কেএইচএএম রাজনীতি ব্যর্থ হওয়ায়। কংগ্রেস হাই-কম্যান্ডের কতকগুলো দিল্লিভিত্তিক অতিবুদ্ধিমান পোষ্য জো-হুঁজুর সদস্যের সবজান্তা আহাম্মকির জন্যেই রাজ্যে রাজ্যে ভারতীয় কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়ে একদিন বিরোধী প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে। গুজরাটে একদা হাই-কম্যান্ডের অঙ্গুলিহেলনে মুখ্যমন্ত্রী মাধব সিংহ সোলাঙ্কিকে বিদায় করার পর সেখানে কংগ্রেসকে আর ফিরে দেখতে হয়নি। এবারের ভোটেও দেখা গেছে, স্থানীয় নেতা শঙ্কর সিংহ বাগেলা হাই-কম্যান্ডের অর্বাচীন তল্পি ধরতে গররাজি হয়ে দলত্যাগ করায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করা কংগ্রেস হাই-কম্যান্ডের পক্ষেও হয়ে ওঠে অসম্ভব। উদ্ভিদ আর রাজনীতির মজা হলো, মাটির সঙ্গে যোগ না থাকলে আসমান থেকে বৃষ্টি নামিয়ে তাকে বাঁচানো যায় না। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 'পিডি' রাজনীতির প্রেক্ষিতে স্থানীয় নেতৃত্ব যে কত মূল্যবান, তার প্রমাণ ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিংহের পঞ্জাব যা বাদল রাজকে ধরাশায়ী করে। অন্ধ্রে প্রয়াত রাজশেখর রেড্ডি একদা, সেখানে কংগ্রেস রাজত্বকে স্থায়ীত্ব দান করতে সমর্থ হন। আসলে কংগ্রেসের যখন দেশজুড়ে রাজত্ব ছিল, তখন গ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশেও তার সংগঠন ও সেবাদল ছিল। যতক্ষণ না সেই গ্রাম ও নগরে গণসমর্থনপুষ্ট সংগঠন মজবুত হয়, ততদিন সব আস্ফালনই শূন্যে সৌধনির্মাণের মতো অলীক হতে বাধ্য। বিজেপি যে শেষ পর্যন্ত গুজরাটে নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, তার একটি কারণ গ্রামান্তরে তার সাংগঠনিক অস্তিত্ব ও অপরটি গুজরাট-গৌরব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন।

গুজরাট একদিকে যেমন বিজেপির পক্ষে এক বিরাট শিক্ষা, কংগ্রেসের তরুণ তুর্কির পক্ষেও এক বিরাট শিক্ষা। একদিন ইন্ডিয়া সাইনিং-এর বিজেপি আহাম্মুখী, অটলবিহারীর জেতা নির্বাচনকে হারিয়ে দিয়ে হারের মালাপরা ইটালিয়ান গান্ধীকে ভারত সম্রাজ্ঞী করে স্ক্যানের চিচিংফাঁকের সুযোগ সৃষ্টি করে। তেমনি গোরক্ষার মহান রাজনীতি, গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রের বঞ্চনা, পিছড়েবর্গের অর্থনৈতিক দাবির যথাযথ সুরাহা বা অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি একদিন কংগ্রেসের নবব্রাহ্মণ অবতারকে প্রধানমন্ত্রীরূপে দেশসেবার সুযোগ করে দিতে পারবে কি না বলা শক্ত। বোধহয় সেই আশাতেই জনপথে রব উঠেছে, কংগ্রেসের মুক্তিসূর্য রাহুলজী যুগ যুগ জিও। ■

হাঁপানিতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

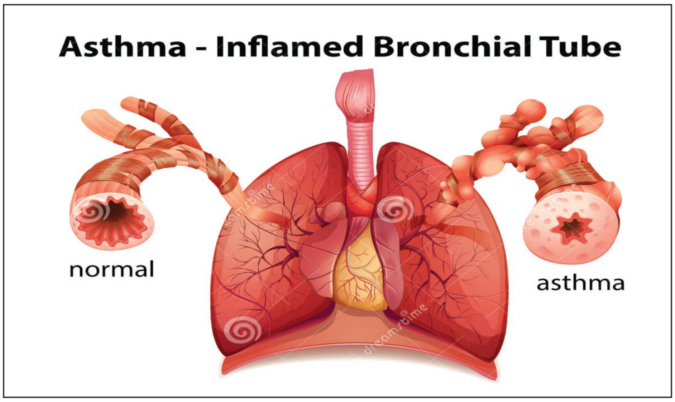

বর্তমান সময়ে পরিবেশ দূষণের সঙ্গে বেড়ে চলেছে অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগীর সংখ্যা। শীতকালে এর আধিক্য দেখা যায়। তবে বর্ষাকালেও এই রোগের বাড়াবাড়ি যথেষ্ট দেখা যায়। সাধারণভাবে অ্যাজমা হলো শ্বাসতন্ত্রের অসুখ সেখানে বায়ুপথ আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এটা হয়ে থাকে এককভাবে বায়ুপথে প্রদাহ বা ক্লোমশাখার (Bronchus) শ্লৈষ্মিকঝিল্লির শোথ হলে কিংবা দুটোই একত্রে হলে। বায়ুপথের এই বন্ধ হওয়াটা কিন্তু বিপরীতমুখী। ফলে রোগীর শ্বাস নিতে ও ছাড়তে কষ্ট হয় এবং রক্ত পরিশোধন বাধাপ্রাপ্ত হয়। এটি একটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগ।

কোনও অ্যালার্জিক বা উত্তেজক বস্তুর প্রভাবে অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষে হাঁপানি দেখা দিতে পারে। যেমন— ধোঁয়া, ধুলো, ফুলের রেণু বা পরাগ, পাখির পালক, জীবজন্তুর লোম, কিছু কিছু খাদ্য ও ওষধি ইত্যাদি অ্যালার্জেন, স্ট্রেস, সংক্রমণ, আর্দ্রতা প্রভৃতি কারণে শ্বাসতন্ত্রের এহেন অবস্থা হয়। আবার বংশগত কারণের জন্যও হাঁপানি পরিলক্ষিত হয়।

অ্যাজমা নতুন ও পুরাতন দুই ধরনের হয়ে থাকে। তবে নতুন রোগের আক্রমণ এবং পুরাতন রোগের হঠাৎ প্রকোপ রোগীর কাছে অসহনীয় হয়। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হলো শ্বাসকষ্ট যা সাধারণভাবে শেষরাত্রে বা ভোরের বেলা দেখা দেয়। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টের সঙ্গে বুকে চাপবোধ ও সোঁ সোঁ আওয়াজ হয়। শ্বাস নেওয়ার জন্য রোগী জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। ওষুধ ছাড়াও কতকগুলি সাধারণ পরিষেবা অত্যন্ত জরুরি। ঘরে যাতে যথেষ্ট বাতাস যাওয়া আসা করে তার ব্যবস্থা করা, রোগীকে স্যাঁতস্যাঁতে ঘর থেকে স্থানান্তর করা দরকার। খুব শ্বাসকষ্ট হলে অক্সিজেন দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অ্যাজমা রোগী চিনতে সাধারণত কোনো অসুবিধা হয় না। হাঁপানি ছাড়াও আরও অনেক কারণে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হৃদযন্ত্রের আকস্মিক নিষ্ক্রিয়তা। তাছাড়া ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি কারণে ইয়োসিনোফিলের পরিমাণ দেখা এবং অ্যালার্জি পরীক্ষা করে দেখে হাঁপানি রোগ নির্ণয় করা হয়।

অ্যাজমাতে ধূমপান, মদ্যপান ও সবরকম তামাক যথা— খইনি, জর্দা, দোক্তা ইত্যাদি খাওয়া পরিত্যাগ করতে হবে। অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধের কম ব্যবহার করতে হবে। অধিক ভোজনও পরিহার করা প্রয়োজন। এর সঙ্গে অধিক মশলাযুক্ত খাবার, মিষ্টি, ভাজাভুজি এবং অ্যালার্জি আছে এমন খাদ্য যেমন— বেগুন, চিংড়ি, ডিম, ট্যাঁড়স প্রভৃতি না খাওয়াই শ্রেয়। সবুজ শাকসবজি ও ফুলকপি, বাঁধাকপি, দুধ, ফল ইত্যাদি অ্যাজমাতে উপকারী। তবে ব্যক্তিবিশেষে খাবারের পরিবর্তন হতে পারে। আর পেশাগত কারণে অ্যাজমা হলে, সেই পেশা বদলানোর প্রয়োজন।

চিকিৎসা : অ্যাজমা চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রসূ। কারণ এতে ওষুধজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। আর্সেনিক, ইপিকাক, সালফার, নেট্রাম সালফ, ক্যালিকার্ব, নেট্রাম মিউর, কার্বোভেজ প্রভৃতি হোমিও ওষুধ কার্যকারী। ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম করতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়, এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। সুস্থ থাকুন। ভালো থাকুন।

(যোগাযোগ : ৯১৬৩২৬৮৬১৬)

অন্য রকম

গৃহহীন মানুষের মাথার ওপর ছাদের কারিগর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তামিলনাড়ুর সাতান্ন বছরের প্রৌঢ়া ড. এম এস সুনীল এখনও সেই দিনগুলোর কথা স্পষ্ট মনে করতে পারেন। সেটা ২০০৫ সাল। অধুনা অবসরপ্রাপ্ত প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপিকা ড. সুনীল তখন পাথানামথিত্তা ক্যাথলিকেট কলেজের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম প্রোগ্রামের দায়িত্বে ছিলেন। সেই সময় কলেজ থেকে ফেরার পথে একদিন তার একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আশা নামের একটি মেয়ের। মেয়েটি ফুটপাতে একটি প্লাস্টিকের ছাউনি টাঙিয়ে তার নীচে থাকত। সব থেকে বড়ো কথা সেই অস্থায়ী ছাউনিকেই সে বলত তার বাড়ি। পিতৃমাতৃহীন মেয়েটির অভিভাবক তখন তার ঠাকুমা। ছোট্ট আশাকে স্রেফ বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঠাকুমা উদয়াস্ত পরিশ্রম করতেন। তাতেও অভাব মিটত না। সেদিনের স্মৃতি রোমন্থন করে ড. সুনীল বলেন, 'প্রথমেই আমার চোখে পড়েছিল একটা পুরনো আর পাতলা হয়ে যাওয়া দোপাট্টা। ওটাই নাকি বাড়ির দরজা! শুনে সেদিন আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল।'

এস এস সুনীল ও এক অসহায় মহিলা।

সেদিনই ড. সুনীল আশার জন্য একটি বাড়ি বানাবার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন অনেকেই। স্থানীয় পঞ্চায়েত জমি দিয়েছিল। অর্থসংগ্রহ অভিযানে নেমেও তিনি নিরাশ হননি। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সহকর্মীরা যে-যেমন পারেন সাহায্য করেছিলেন। সেই সময় বাড়িটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল এক লক্ষ টাকা। ড. সুনীল বলেন, 'এখন আশা একটা স্কুলে পড়ায়। বিয়ে করেছে। শুধু তাই নয়, টাকা জমিয়ে একটা গাড়িও কিনেছে। প্রতিদিন নিজে ড্রাইভ করে স্কুলে যায়। ওদের মেয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়ে।'

একটা বাড়ি আশার জীবনটাকেই বদলে দিয়েছে। না, শুধু আশা নয়, বদলে গেছেন ড. সুনীল নিজেও। ২০০৫-র পর তিনি আর পিছন ফিরে তাকাননি। এখনও পর্যন্ত ৮৩ জন বেঘর মানুষের মাথার ওপর ছাদ দিয়েছেন। তাদেরই একজন ৫৫ বছরের সুশীলা। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা থাকা সত্ত্বেও যার দিন কাটত ফুটপাথে, একটি ছাতার নীচে। কিংবা অথিরুঙ্কালের উদয়ভানু। গাছ পড়ে যাওয়ার ফলে যার পায়ের হাড় টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল, স্ত্রীও জটিল অসুখে শয্যাশায়ী, মেয়ের ব্রেন ক্যান্সার— এমন একটি পরিবার গাছতলা থেকে ড. সুনীলের হাত ধরে উঠে এসেছিল নিজেদের বাড়িতে। একথা বলা ভুল হবে আশাকে দেখার পরই প্রথম ড. সুনীল গরিব এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের যন্ত্রণা অনুভব করেন। সলতে পাকানোর কাজ অনেকদিন ধরেই চলছিল, আশার ঘটনায় তিনি স্ফুলিঙ্গের সন্ধান পান। যখন ছাত্রী ছিলেন তখন হোস্টেলের ক্যান্টিন থেকে খাবার নিয়ে সমুদ্রের ধারে ভিক্ষে করা বাচ্চাদের মধ্যে বিতরণ করতেন। অবসর নেওয়ার পর তিনি গরিব মানুষের সেবার কাজে পুরোপুরি নেমে পড়েছেন। গত বারো বছর ধরে বাড়ি তৈরি করার পাশাপাশি চলছে শ্রবণযন্ত্র বিতরণ করার কাজ। এত কাজ করছেন তবুও তার নিজের কোনও সংস্থা নেই। অর্থ জোগানের উৎসও সীমিত। চেনা-পরিচিত কিছু মানুষ রয়েছেন যাদের উৎসাহ আর প্রেরণাই তার সম্বল।

এখনও পর্যন্ত যত বাড়ি তৈরি করেছেন বেশিরভাগই তাঁর নিজের জেলা পাথানামথিত্তায়। কোল্লাম জেলায় তিনটি বাড়ি তৈরি হয়েছে। আলেপ্পিতে তিনটি বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। ড. সুনীল বলেন, 'কার জন্য বাড়ি তৈরি করা হবে সে ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্তরে খোঁজখবর করা খুবই জরুরি। আমরা সাধারণত যেসব বিধবা মহিলা কন্যাসন্তানদের নিয়ে খোলা রাস্তায় থাকতে বাধ্য হন, তাদের কথা আগে ভাবি। এই ধরনের মহিলারা সরকার বা এনজিওগুলির কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য পান না। এছাড়া, যেসব পরিবারের কোনও সদস্য মারণব্যাধিতে আক্রান্ত অথচ যাদের মাথার ওপর কোনও ছাদ নেই, তাদের কথাও ভাবতে হয়।'

নিজের কোনও সংস্থা না থাকার কারণে ড. সুনীলকে সাহায্য করেন স্থানীয় সমাজসেবী জয়লাল। বিশেষ করে বাড়ি তৈরির ব্যাপারে। জয়লালই কিছু স্পনসর জোগাড় করে দেন। এছাড়া কোনও উপায়ও নেই। ২০০৫ সালে একটা বাড়ি তৈরি করতে খরচ পড়ত ১ লক্ষ টাকা। এখন সেই খরচ বেড়ে হয়েছে ২.৫০ লক্ষ টাকা। প্রতিটি বাড়িতে থাকে একটি শোবার ঘর, একটি হল, রান্নাঘর, বসার ঘর এবং টয়লেট। ছাদ হয় গ্যালভানাইজড আয়রন শিটের। কিছু পরিবারকে সৌরবিদ্যুত চালিত ল্যাম্প বা এলইডি বাল্ব দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, বিদ্যুতের খরচ বাঁচানো। এই ধরনের একটি বাড়ি তৈরি করতে ৩০ থেকে ৩৫ দিন সময় লাগে। ■

শোকসংবাদ

জলপাইগুড়ি জেলার দলটানা শাখার মুখ্যশিক্ষক রাজীব রায়ের বাবা ফুলেন রায় গত ১৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলা কার্যবাহ মদন বিশ্বাসের মাতৃদেবী

হেনা রানি বিশ্বাস গত ১৭ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, মদনদা বেশ কয়েক বছর মালদহে মহকুমা প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার বজরঙ্গদলের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক রতন তরফদারের মা আরতি তরফদার গত ১৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বীরভূম জেলার বোলপুরের স্বয়ংসেবক তথা জেলা সামাজিক সমরসতা সংযোজক অজয় কুমার দাসের মা শিবানী দাস গত ১৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তাম্রলিপ্ত জেলা প্রচারক বৈদ্যনাথ মণ্ডলের পিতৃদেব গোরাচাঁদ মণ্ডল গত ১০ ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার দুবরাজপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ কন্যা, ৪ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, বৈদ্যনাথ কনিষ্ঠপুত্র।

* * *

গত ১২ ডিসেম্বর দুর্গাপুর নগরের স্বয়ংসেবক তথা ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের পূর্বতন সম্পাদক এবং বর্তমান সেবা সংস্থার কার্যকর্তা প্রশান্ত ভৌমিক পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে রেখে গেছেন।

মঙ্গলনিধি

গত ১২ ডিসেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট নগরের স্বয়ংসেবক দিলীপ সরকারের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন তাঁর মা শঙ্করী দাস শ্রীমতী নিভা সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাপ্রচারক মলয় দত্ত, বাঁকুড়া বিভাগপ্রচারক বিজয় পাতর-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা-সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ শুভেন্দু দাসের শুভবিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন তাঁর মা শঙ্করী দাস বিভাগ কার্যবাহ কাজলবরণ সিংহের হাতে। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্ত নবদম্পতিকে আশীর্বাদ প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রচার প্রমুখ মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, জেলা কার্যকারিণীর সদস্য মোহন চট্টোপাধ্যায়- সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

গত ১৭ ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলা সহ-সেবা প্রমুখ জয়ন্ত শীল তাঁর পুত্র তথা বিষ্ণুপুরনগরের স্বয়ংসেবক সুজয় শীলের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন বাঁকুড়া জেলা কার্যবাহ তরুণ লায়েকের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা সেবা প্রমুখ শিশির গঙ্গোপাধ্যায়ে-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

গায়ক, সুরকার এবং সঙ্গীতশিক্ষক জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় আর নেই। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়েস হয়েছিল বিরাশি বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যাকে। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নামটা শুনলেই মনে পড়ে যায়, 'এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার...' গানটির কথা। তিনি অনেক গান গেয়েছেন, অনেক গানে সুরারোপ করেছেন কিন্তু ওই বিশেষ গানটি হয়ে গিয়েছিল তার সিগনেচার সং। উত্তর কলকাতায় জন্ম এবং সেখানেই বেড়ে ওঠা এই শিল্পী জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন মজলিশি মেজাজ। যা তার গানে পরিষ্কার ফুটে উঠত। গান শিখেছিলেন বাংলা লঘুসঙ্গীতের দিকপাল সঙ্গীতশিক্ষক চিন্ময় লাহিড়ি এবং সুধীন দাশগুপ্তের কাছে। পরে নিজস্ব গায়নশৈলীতে অনন্য হয়ে ওঠেন। ৭০-৮০-র দশকে তার গান ছাড়া রেডিয়োর অনুরোধের আসরের কথা ভাবাই যেত না। ভাল গায়ক, সুরকার যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন গুণী সঙ্গীতশিক্ষক। বহু ছাত্রছাত্রী তার কাছে গান শিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সঙ্ঘ-অনুপ্রাণিত সংস্কার ভারতীর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ শোকপ্রকাশ করেন।

ডাকটিকিটে সত্যেন্দ্রনাথ বোস

সত্যেন্দ্রনাথ বোস (১ জানুয়ারি ১৮৯৪— ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) একজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি পদার্থবিদ ও অধ্যাপক।

গত শতকের তৃতীয় দশকের প্রথমে কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর উপর তাঁর অভূতপূর্ব গবেষণা বিশ্ব বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই গবেষণা বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের এবং বোস- আইনস্টাইন কন্ডেনসেট-এর মূল-ভিত্তি। তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তাঁর গবেষণা কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে তাঁকে পদ্ম-বিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে।

ডাকটিকিটে সত্যেন্দ্রনাথ বোস

১৯৯৪ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে ভারতীয় ডাক বিভাগ একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল, সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম দিনের আবরণী খাম (ফার্স্ট ডে কভার) এবং ডাকটিকিট সংক্রান্ত তথ্য-পুস্তিকা। সত্যেন্দ্রনাথ বোস সংক্রান্ত ডাকটিকিটের টেকনিক্যাল তথ্য :

প্রকাশ তারিখ : ১ জানুয়ারি, ১৯৯৪

ডাক-মূল্য : ১০০ পয়সা

সামগ্রিক আকার : ৩.৯১ × ২.৯০ সেমি

ছাপানো আকার : ৩.৪৪ × ২.৫৪ সেমি

প্রতিটি ছাপানো পাতায় ডাকটিকিটের সংখ্যা : ৩৫

ডাক-টিকিটের রং : এক রঙা

ছিদ্র : ১৩ × ২৬

ছাপানোর পদ্ধতি : ফটো গ্র্যাভিওর

ছাপানো ডাকটিকের সংখ্যা : ০.৬ মিলিয়ন।

ডাকটিকিটে দেখা যায় অধ্যাপক বোস একটি গ্রন্থ অধ্যয়নরত। টিকিটের একদম উপরের বাঁ-দিকে হিন্দিতে তাঁর নাম, ডানদিকে ডাক মূল্য; ইরেজিতে তাঁর পুরো নাম বাঁ-দিকে; তলায় হিন্দি ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ভারত ও ইন্ডিয়া লেখা। এই ডাকটিকিট সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেছে কলকাতার সত্যেন্দ্রনাথ বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সে।

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

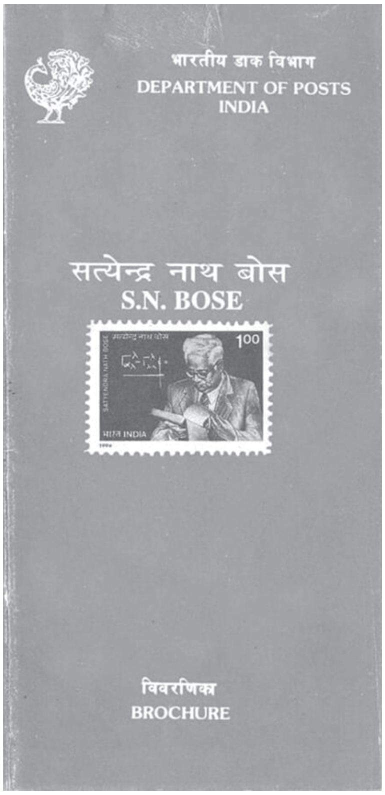

ডাকটিকিট তথ্যপুস্তিকা।

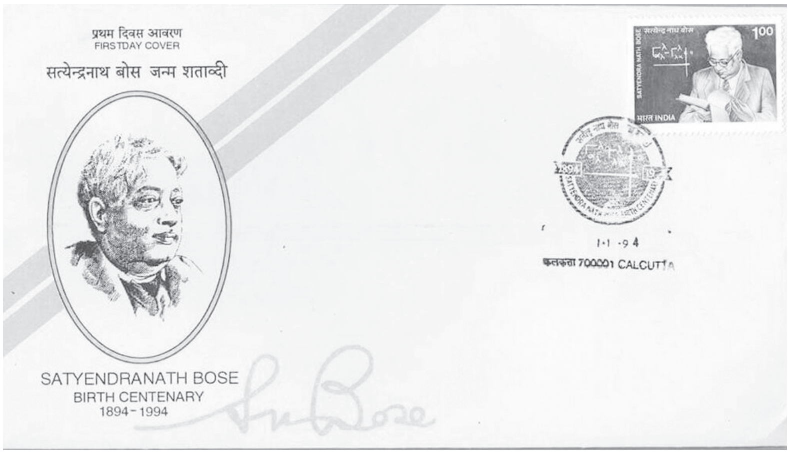

প্রথম প্রকাশ আবরণী খাম

ভারতের পথে পথে

কাশীপুর উদ্যানবাটী

১৮৮৬ সালে ১ জানুয়ারি বাঙালি মানসে উজ্জ্বল হয়ে আছে কল্পতরু দিবস হিসেবে। ওই দিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব কল্পতরু হয়েছিলেন, অর্থাৎ ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। সেদিন ঠাকুরের কাছে যে যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে। কাশীপুরে রানি কাত্যায়নীর জামাতা বলরাম বসুর বাড়িতে তিনি তাঁর এই স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। সেই বাড়িটি এখন কাশীপুর উদ্যানবাটী নামে পরিচিত। তখন থেকে এখনোও পর্যন্ত প্রতিবছর ১ জানুয়ারিতে হাজার হাজার ভক্ত সমাগম হয় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। ইংরেজি নতুন বছরের উন্মাদনাকে উপেক্ষা করে ভক্তরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাকুরের কাছে গিয়ে নিজের প্রার্থনা জানায়।

জানো কি?

- পঞ্জাব ও হরিয়ানা দুই রাজ্যের রাজধানী চণ্ডীগড়।
- অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী এখন অমরাবতী।
- নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানার রাজধানী হায়দরাবাদ।
- কর্ণাটকের রাজধানী ব্যাঙ্গালোরকে বলতে হবে ব্যাঙ্গালুরু।
- কর্ণাটকের একটি বড় শহর ম্যাঙ্গালোরকে বলতে হবে ম্যাঙ্গালুরু।

ভালো কথা

লালুর বুদ্ধি

গরমের সময় আমরা পাড়ার বড় পুকুরে স্নান করি। যেদিন বাবা সকালেই অফিসে চলে যান সেদিন বেশি স্নান করি। চোখ লাল হয়ে যায়। পিসিমণি বকাবকি করলে তখন পুকুর থেকে ওঠি। সেদিন মামাবাড়ির বুলিদি ও ফুলিদি আমাদের বাড়ি এসেছে। সঙ্গে এসেছে ওদের বাড়ির লালু। লালু খুব বড় ও নাদুসনুদুস। বুলিদি ও ফুলিদি সেদিন আমাদের সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে এসেছে। ফুলিদি সাঁতার জানে না। তাই পাড়েই বসেছিল। কখন যে আমাদের দেখাদেখি পুকুরে লাফ দিয়েছে, আমরা বুঝতেই পারিনি। লোকের চিৎকার শুনে দেখি লালু ফুলিদির মাথার চুল কামড়ে ধরে টেনে পাড়ে এনে খুব লেজ নাড়াচ্ছে আর ফুলিদির দিকে তাকিয়ে গর্‌র্ করছে। মানে শাসন করছে। ভাগ্যিস্ সেদিন লালু ছিল তাই ফুলিদি বেঁচে গেল। মা সেদিন লালুকে বড় বাটি ভর্তি মাংস দিয়েছিল।

সর্বাণী সেন, দশম শ্রেণী, বালুরঘাট।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

জল

মৌনব দাস, ষষ্ঠ শ্রেণী, কলকাতা-৬

জলই আমাদের প্রাণ
জল করে জীবন দান,
জল না থাকলে পৃথিবীতে
পাওয়া যেত না প্রাণের সন্ধান।।
যদি নষ্ট করি জলাশয়
ধেয়ে আসবে ভীষণ ভয়,
ধ্বংস হবে প্রকৃতি
সকল প্রাণ হবে ক্ষয়।।

গাছপালা সব শুকিয়ে যাবে
জীবজন্তু খাবি খাবে,
জগৎ হবে প্রাণশূন্য
ধূ ধূ বালি শুধুই রবে।।
বন্ধ হোক জলের অপচয়
পূর্ণ থাক সকল জলাশয়,
তাহলে বাঁচবে জীব, বাঁচবে জগৎ
তখন আনন্দ আর আনন্দ বিশ্বময়।।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। অভিমন্যু ।। ৬

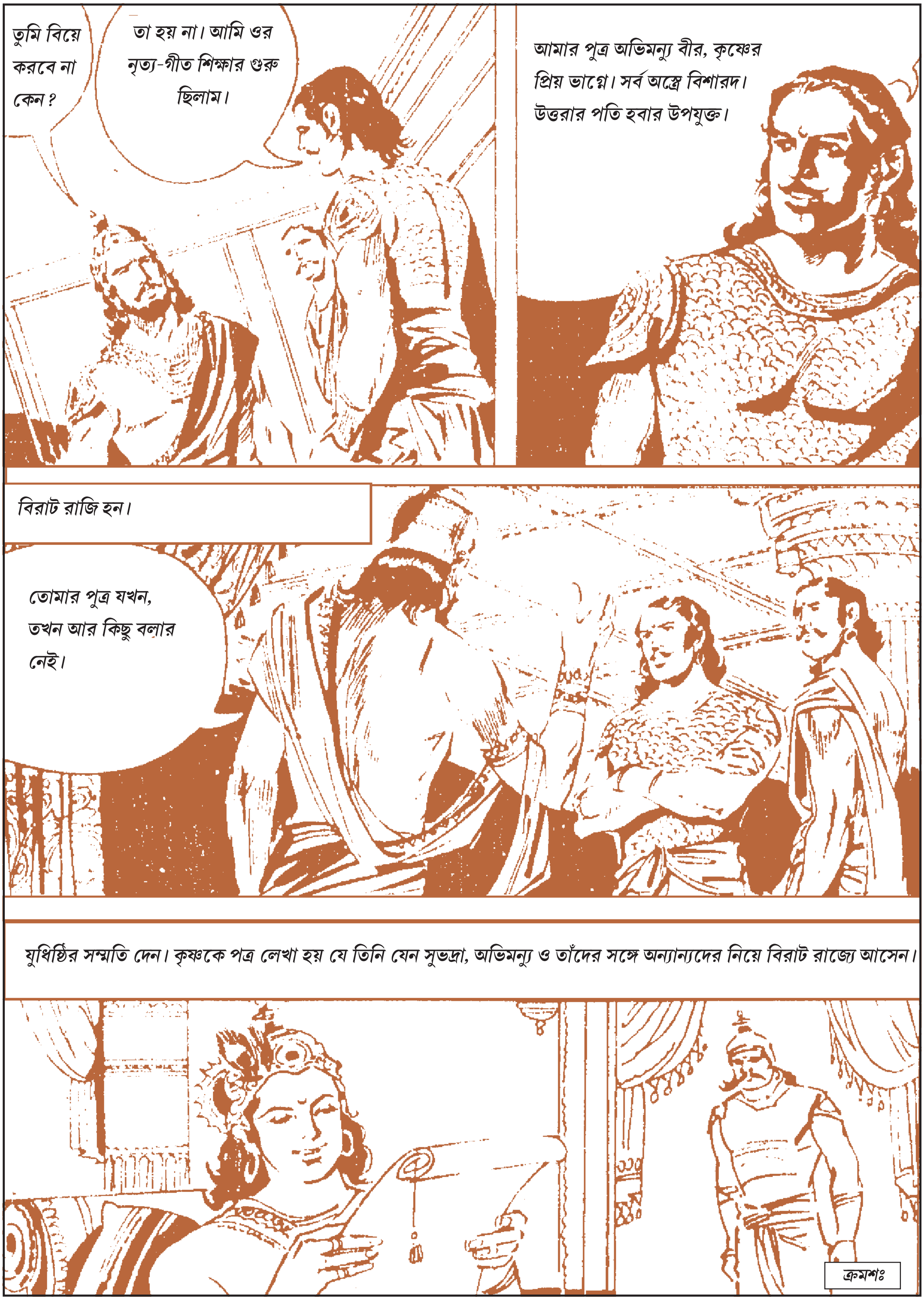

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57   Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
1 January - 2018 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্ টাকা ।।